উপনিবেশ-বিরোধী চর্চা ও আমরা => কি করিতে হইবে (না) =>

অমিয়কুমার বাগচী সাক্ষাৎকার

‘ইংল্যান্ডের যে সাম্রাজ্যবাদ, সেটা হচ্ছে লাভের জন্য - পাওয়ার ফর প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট ফর পাওয়ার। এইভাবে জিনিসটাকে বুঝতে হবে। এটা ভারতবর্ষ অধিকার করার আগেই ওখানেই উপনিবেশ ভেতর থেকে তৈরি হয়েছিল।’

অশেষ সেনগুপ্ত ।। বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ,
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

জ্ঞানগঞ্জ ১৯ নং পুথি ।। আলাপ পুথি ৩ ।। ডিসেম্বর ২০২৪ ।। পৌষ ১৪৩১
উপনিবেশ বিরোধী চর্চা - কি করতে হইবে না - অমিয়কুমার বাগচী সাক্ষাৎকার
Ki korite Hoibe Na - Amiya Kumar Bagchi Sakkhatkar

১৭৭০/১১৭৬ *গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার* প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ২৪/১৮, নাবালিয়া পাড়া রোড, কলকাতা - ৭০০০০৮-এর পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, অত্রি ভট্টাচার্য

ছাপা বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, দেবাইপুকুর রোড, হিন্দমোটর, হুগলী

দাম ৭০ টাকা

কপিরাইট-মুক্ত প্রকাশনা

'ইওরোপীয়-বিস্ময়'-এর(ইওরোপিয়ান মিরাকল) আখ্যানের নির্মাণ নির্ভর করে রয়েছে ইওরোপীয় ইতিহাসের একধরণের 'নির্বাচিত' ব্যবহারের উপর, মানবজাতির বিপুল অংশের ইতিহাস বিলুপ্তি ঘটানোর প্রচেষ্টায়, তথাকথিত মুক্ত বাজারগুলিকে সক্রিয় করে ইওরোপীয় সভ্যতা, বিশ্বের 'বাকি' অংশ জয় করার মিথ্যা বাখানের উপর। এই আখ্যান পশ্চিম ইওরোপীয় দেশগুলি এবং তাদের বিদেশী শাখাগুলিকে বিশ্বের প্রভাবশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার ক্ষেত্রে সশস্ত্র দখলদারির ভূমিকা অস্বীকার করে।'

- অমিয় বাগচী, *পেরেলেস প্যাসেজ: ম্যানকাইন্ড অ্যান্ড দ্য গ্লোবাল অ্যাসেন্ডেন্সি অফ ক্যাপিটাল*

ঔপনিবেশিক শক্তির কার্যকারিতা এবং ভারতবর্ষে পুঁজিবাদী বিকাশে তাদের প্রভাব অমিয় কুমার বাগচীর চিন্তাপ্রণালীর মূলে থেকেছে বারংবার। সামগ্রিকভাবে, 'পুঁজিবাদ' বিতর্কে উত্তরণের ক্ষেত্রে তিনি একটি মার্কসবাদী কাঠামোই গ্রহণ করেছেন, যা ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বহুকাল ধরেই। ইতিহাস রচনার বৃহত্তর এবং পুরাতনী পরিমণ্ডলের কিছু কেন্দ্রীয় অনুষঙ্গ তিনি অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা ক্ষেত্রের আরও সাম্প্রতিক কিছু পঠনপদ্ধতি ও বর্গ, যার সঙ্গে একটি শাসনতন্ত্র হিসাবে 'উপনিবেশায়ন'কে পর্যালোচনা করা জড়িত রয়েছে, সে সব ব্যবহার করে আমাদের প্ররোচিত করেন উত্তর-পূর্বের ভারতবর্ষীয় বণিকসমাজ ও বাণিজ্যপরিমণ্ডলের সাথে উপনিবেশের লড়াই বুঝতে (তাঁর 'মার্চেন্টস অ্যান্ড কলোনিয়ালিজম' মনোগ্রাফটি দ্রষ্টব্য)।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন অষ্টাদশ শতাব্দীকে মূলত 'পতনের যুগ' হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা, আসলে কার্যকারিতায় সেই সময়টা ছিল চলতি সামাজিক সম্পর্কভিত্তিক স্থানিক উৎপাদন-কাঠামো ধ্বংসের প্রহর, এ কথা তিনি বহুবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। যে শক্তিশালী এবং প্ররোচিত ঔপনিবেশিক জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তি, ঔপনিবেশিক শাসনের সাথে দীর্ঘমেয়াদী বি-শিল্পায়নকে কার্যকারণ সম্পর্কের মাধ্যমে বোঝে, তাকে তিনি বারবার প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। উপনিবেশপূর্ব বণিকদের, যাদের কারিগরির সাথে, স্থানীয় কারিগরদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল, তাদের ধ্বংস করার 'সাম্রাজ্যবাদী' বিকৃত প্রভাব তিনি প্রগতির শর্তে বুঝতে চান নি। তাই তিনি দুই শতাব্দী ধরে চলে আসা ঔপনিবেশিক লুঠকে বহমান সময়ে,

গোলকায়ন-পরবর্তী পৃথিবীর IMF-আঙ্গিকের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SAP)- এর সঙ্গে জুড়ে দেখেন। আমাদের মনে করাতে চান, ভারতবর্ষে IMF প্রণোদিত কাঠামো পরিবর্তন-কর্মের পূর্বসূরিই দীর্ঘ দু'শতাব্দ ব্যাপী ঔপনিবেশিক স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SAP)। ঔপনিবেশিক SAP-এর প্রভাবে লক্ষ লক্ষ কারিগরের জীবিকা হারানো, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার জন্য বিনিয়োগ কমানো, ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে অনেক অংশে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক উপায় থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, অথবা ইওরোপীয়দের অধীনস্থ ব্যবসা সহযোগী বানানোর মত উপনিবেশের নীতিকে প্রশ্নকরা অমিয় বাগচী ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ১৭৭০-এর বাংলার দুর্ভিক্ষকে সরকারীস্তরে নথিভুক্ত হতে না দেওয়ার উপনিবেশিক অপরাধকে কখনো অন্য ইওরোপমন্য প্রগতিশীলদের মত চিনির সিরা দিয়ে ঢাকতে চাননি। জ্ঞানগঞ্জ, একটি অ-প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা সংস্থা হিসেবে সত্তরের মন্বন্তরকে, উপনিবেশ-কর্তৃক ঘটানো গণহত্যা বলতেই অভ্যস্ত।

একথা, আমাদের জন্য গর্বের যে তার প্রয়াণের কিছুকাল আগে তার হাতে জ্ঞানগঞ্জের কিছু মাসিক পুঁথি পৌঁছে দেওয়া গেছিল। এই সাক্ষাৎকারের প্রকাশও তার আজীবন বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ের প্রতি আমাদের একপ্রকার শ্রদ্ধার্ঘ্য।

মৌখিক সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপি করেছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী সৃজনী ভুঁইয়া, তাকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কলকাতা কমন্সকে, যারা এই প্রকাশিতব্য কথোপকথনটিকে আজও নিজেদের ডিজিটাল মহাফেজখানায় মজুত রেখেছেন।

উপনিবেশ নিপাত যাক।
অমিয় বাগচীর বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্য দীর্ঘজীবী হোক।
বাংলার চাষী কারিগর হকার ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক।

ধন্যবাদান্তে,
অত্রি ভট্টাচার্য

উপনিবেশের দুই শতক - বিশ্বের প্রথম কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক শিল্প পুঁজির গঠন

অমিয়কুমার বাগচীর সঙ্গে অশেষ সেনগুপ্ত, বিশ্বেন্দু নন্দের আলাপ

জানা নেই অমিয়কুমার বাগচী ছাড়া অন্য কোন দক্ষিণ এশিয় বামপন্থী অর্থনীতিবিদ উপনিবেশকে স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং ইওরোপ, অইওরোপিয় দেশগুলোয় উপনিবেশ তৈরির আগে নিজেদের দেশগুলোয় উপনিবেশ তৈরি করেছিল। এমত ব্যতিক্রমী অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিল কলাবতী মুদ্রার পক্ষ থেকে বিশ্বেন্দু নন্দ এবং কলকাতা কমনসের পক্ষ থেকে অশেষ সেনগুপ্ত, ১১ জুলাই ২০২১-এ আরেক লুঠেরা সময় করোনাকালে কলকাতা কমনসের ওয়েব পোর্টলে। অশেষ সেনগুপ্ত, বিশ্বেন্দু নন্দ সেই সাক্ষাতকারে জানতে চেয়েছে উপনিবেশ বিরোধী চর্চার গুরুস্থানীয় তাত্ত্বিক অমিয়বাবুর মত মানুষদের সঙ্গে মাঠে-ঘাটে কাজ করা উপনিবেশ বিরোধী চর্চকদের কেন এবং কোন কোন বিষয়ে ধারাবাহিক আলোচনা চালানো অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উপনিবেশ আর দরবারি কৃষ্টি শিখিয়েছে জ্ঞানচর্চায় গুরুই শেষ কথা, গুরুর তাত্ত্বিক অবস্থানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করা অনুচিত - যে ধারণা থেকে গুরুবাদ শব্দের আবির্ভাব। জ্ঞানগঞ্জ, কলাবতী মুদ্রা, কলকাতা কমনস জানে বাংলা ভূখণ্ডে গুরুকে যথোচিত গুরুত্ব-সম্মান প্রদর্শন করেই তার ভাবনার খামতি, তা না বোঝার জায়গাগুলো, গুরুর তাত্ত্বিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে অন্য ধরণের ভাবনার কাটাছেঁড়ার উদাহরণ কম নয়। এই ধরণের তাত্ত্বিক-প্রায়োগিক অবস্থান নাথপন্থে দেখি, গুরুকে উদ্ধার করতে আসরে অবতীর্ণ হন শিষ্য। গুরুর তাত্ত্বিক অবস্থানকে অতিক্রম না করার মিথ আসলে দরবারি-উপনিবেশি কৃষ্টির, কেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ - জনজীবনে এই ভাবনায় প্রতিফলন খুবই অল্প। দরবারি ভদ্রবিত্ত কাঠামোর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন যেন সারাক্ষণ মার্ক্সের প্রতিধ্বনি করছেন - সব কিছুকেই প্রশ্ন কর। বিশ্বেন্দু, অশেষ এবং তার সাথীরাও এই পথানুগামী হয়েছে, এবং অমিয়কুমার বাগচীর সঙ্গে আলাপচারিতায় সে ধারণা ফুটে উঠেছে। গুরুবাণী যেহেতু দৈববানী নয়, সাক্ষাৎকার শেষে তিনটে রিজয়েন্ডার দেওয়া হয়েছে তাঁর কাজের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই। বলাভাল এই সাক্ষাৎকারের সাড়ে তিন বছর পরেও অমিয়-মুগ্ধতা গাঢ় হয়েছে। যে মানুষ সারাজীবন কাটিয়েছেন পুঁজি সংহত হওয়ার প্রকরণ আর উপনিবেশের চলন বুঝতে, সেই মানুষই অসীম গুরুপ্রতীম ঔদার্যে দুই অর্বাচীনের আলোচনায় গুরুত্বসহকারে অংশ নিয়েছেন, বক্তব্য শুনেছেন, তাঁর উত্তর পেশ করেছেন।

উপনিবেশ বিরোধী চর্চায়, উপনিবেশের চলন, হৃদিঅক্ষ বুঝতে গত দেড় বছরের সময়সীমায় জ্ঞানগঞ্জ দুটি আলাপচারিতা করেছে 'জ্ঞানগঞ্জ আলাপ পুথি - উপনিবেশ বিরোধী চর্চা ও আমরা - কি করিতে হইবে না' শীর্ষক ধারাবাহিকে - আদিত্য নিগম এবং নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সঙ্গে। দুটি পুথি হিসেবে প্রকাশিত। জ্ঞানগঞ্জ এবং কলাবতী মুদ্রা, অশেষ এবং কলকাতা কমনসের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে তৃতীয় আলাপ পুথি ভূমিষ্ঠ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য। অশেষের মত অর্গানিক ইন্টালেকচুয়াল আন্দোলনে আরও আসুন, আরও আলাপের পথ উন্মুক্ত হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে এই আলাপচারিতা জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদন করাগেল।

অমিয়বাবু গত মাসে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। কয়েক মাস আগে জ্ঞানগঞ্জের পক্ষে অত্রি ভট্টাচার্য কয়েকটা জ্ঞানগঞ্জের পুথি তাঁর হাতে ধরিয়ে এই সাক্ষাৎকারকে পুথি হিসেবে ঢেলে সাজার ইচ্ছে জানিয়ে এসেছিল। তিনি খুশি হয়েছিলেন। জ্ঞানগঞ্জের দুর্ভাগ্য ১৯ নম্বর আলাপ পুথি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া গেল না। পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে উপনিবেশিক লুঠ অভিচারকে গুরুত্ব দিয়ে কাজকর্ম করা পণ্ডিতের সংখ্যা হাতে গোণা। তিনি সেই কাজ জীবনের ব্রত হিসেবে গণ্য করেছিলেন। এই ছোট্ট পুথি প্রকাশের মাধ্যমে

জ্ঞানগঞ্জ অমিয়কুমার বাগচীর তাত্ত্বিকতায় উপনিবেশ চর্চা শুরু করল। আশা করা যায় আগামী দিনে এই চর্চা আরও বিস্তৃত হবে। এই খণ্ডে সাক্ষাৎকার ছাড়াও 'কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি'-র ভূমিকা অধ্যায়টির মূল বক্তব্য বুলেট পয়েন্ট হিসেবে সাজিয়ে দেওয়া গেল। আলাপ পুথি ৩ হল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রথম ধাপ।

এই আলাপচারিতাকে লিপিবদ্ধ করেছেন জ্ঞানগঞ্জের স্বেচ্ছাসেবক সৃজনী ভুঁইয়া। তাঁকে ধন্যবাদ। পুথি সম্পাদনা করার সময় উপনিবেশ সংক্রান্ত বিষয় বোঝাতে উপনিবেশি, উপনিবেশিক, ঔপনিবেশিক, তিন ধরণের বানান ব্যবহার করা হয়েছে। উপনিবেশিক দক্ষিণ এশিয়াকে কখনও ভারত, কখনও ভারতবর্ষ লেখা হয়েছে। তৃতীয় বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে সম্পাদকদের মন্তব্য। অমিয়বাবুর একটি মন্তব্য প্রেক্ষিতে দেবোত্তম চক্রবর্তীকে মন্তব্য করতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর পাঠানো একটি ছোট লেখা সাক্ষাৎকার শেষে জোড়া গেল - বিশ্বেন্দু

অশেষ সেনগুপ্ত - নমস্কার। কথোপকথনে আপনাদের স্বাগত। কলকাতা কমনসের পক্ষ থেকে আমি অশেষ সেনগুপ্ত। আমার সঙ্গে আছেন বাংলায় বর্তমান উপনিবেশ বিরোধী চর্চার অন্যতম কর্মী শ্রী বিশ্বেন্দু নন্দ। আমরা দুজনে আজকে কথা বলব অধ্যাপক শ্রী অমিয়কুমার বাগচীর সঙ্গে। আমাদের আজকের কথোপকথনের শিরোনাম 'উপনিবেশের দুই শতক - বিশ্বের প্রথম কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস এবং আন্তর্জাতিক শিল্প পুঁজির গঠন।' যারা ভোরে উঠে বা রাতে না ঘুমিয়ে সকালে খেলা দেখেছেন, আবার রাত জাগারও পরিকল্পনা আছে, তাদেরকে বলার, সম্ভব হলে আমরা আজকের দিনটা কথোপকথনের পরিকল্পনা না করারই চেষ্টা করতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি, হলে, আমার নিজেরও সুবিধে হত। একদা উপনিবেশ লাতিন আমেরিকার ফুটবল সম্পর্কে আহত রোমান্টিকতা নিয়ে উপনিবেশিক ইওরোপিয় ফুটবল তো দেখতেই হবে, এরকম অভ্যস্ততায় যারা আবার রাত জাগার কথা ভাবছেন, মধ্যে ঘন্টা দু-এক হাতে থাকলে, তারা আপাতত এই আলোচনায় যোগ দিতে পারেন।

লাতিন আমেরিকার এই উপনিবেশগুলো যখন তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করছে, তখনও কিন্তু আমাদের দেশে রাণীর শাসন কায়েম হয় নি। এশিয়ায় পৌছনো ইওরোপিয় উপনিবেশিক শক্তি, লাতিন আমেরিকার কাঁচামাল লুঠের উপনিবেশের ইতিহাস থেকে সম্ভবত যথেষ্ট শিক্ষা নিয়েছিল। ফলে, লাতিন আমেরিকায় যখন প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখলদারির উপনিবেশিক জুলুমবাজি চলছে, তখন এখানে দক্ষিণ এশিয়ায়, বাংলায়, উপনিবেশিক শক্তিগুলো প্রাক-উপনিবেশিক উৎপাদন সম্পর্কগুলোকেই নিজেদের চেনা ছাঁচে পালটে নেওয়ার কাজ করছে। এই পালটে নেওয়াটা, অর্থাৎ উৎপাদনের শর্তগুলোকেই পালটে দেওয়াটা - গোদা ভাবে বললে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস বলে ভাবা যেতে পারে।

অধ্যাপক অমিয় বাগচীর কথা শোনার আগে, কেন তাঁর কাজ উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় আমাদের কাছে এতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটা আমরা বিশ্বেন্দুদার কাছ থেকে প্রথমে একটু বুঝে নিতে চাইব। তোমাকে আমি কিছু প্রশ্ন করি, তুমি উত্তর দাও, তাতে হয়ত আমাদের দুজনেরও সুবিধা হবে, দর্শকদেরও বুঝতে সুবিধা হবে। প্রথম প্রশ্নটা আমি এভাবে করি, প্রাক-উপনিবেশকে বুঝতে, ১৭৫৭ পূর্ববর্তী বাংলার ইতিহাস নিয়ে তুমি বেশ কিছুদিন ধরে গবেষণা করছ। সেই সমস্ত গবেষণা নিয়ে কারিগর সংগঠনের পক্ষ থকে ধারাবাহিক ভাবে পত্রিকা প্রকাশ করেছ। পলাশির পূর্বে বাংলার বাণিজ্য নিয়ে তোমার বইটা এখন প্রাক-উপনিবেশের বাংলা বুঝতে একটা জরুরি রেফরেন্স হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুলোর বিশ্ব-ইতিহাস, দ্য মুঘল এডমিন্সট্রেশন, আওরঙ্গজেবের উপাখ্যান এগুলো অনুবাদ করেছ। এই সময়ের ইতিহাস নিয়ে কাজ করার সূত্রে, অর্থনৈতিক ইতিহাসের উপাদান তুমি কতটা পেয়েছ?

বিশ্বেন্দু নন্দ - নমস্কার। দর্শকদের নমস্কার, আর তোমাকে ধন্যবাদ। এরকম এটা আলোচনা উপহার পেলাম তোমার সৌজন্যে। তুমি খুব জরুরি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছ। বাংলার প্রেক্ষিকে সমান্তরালভাবে বিশ্ব প্রেক্ষিতও বলা যায়। যেহেতু বাংলা বহুকাল ধরে বিশ্ব অর্থনীতির বড় অংশ ছিল, ফলে বিশ্ব প্রেক্ষিতেই এই কথাটা বলা যায়, আজকের আলোচনায় অর্থনীতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ধর, আমরা মুলত বাংলার উপনিবেশপূর্ব সময়ের যে ইতিহাস পেয়েছি, সেটা মুলত ইতিহাসবিদেরাই আলোচনা করেছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম ঐতিহাসিক আলেজান্ডার ডাও, রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নওরোজি, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ, নিরদ চৌধুরীর পুত্র কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী, পলাশীকে অন্য ভাবে দেখতে শেখানো সুশীল চৌধুরী, ওম প্রকাশ, কুমকুম চ্যাটার্জী বা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, শিরিন আখতার এবং হাজারো পণ্ডিত যারা কখনও না কখনও বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু তারা মূলত ইতিহাসবিদ। তাদের প্রশিক্ষণ ইতিহাস গবেষণায়। অনেকেই অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু প্রাথমিকভাবে তারা ঐতিহাসিক। তারা প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাসের তাত্ত্বিক অবস্থান ধরেই উপনিবেশিক অর্থনীতি আলোচনা করেছেন। এই উপনিবেশিক অর্থনীতির আলোচনায় প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনৈতিক তাত্ত্বিক উপাদানগুলো নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। এখুনি বিশ্লেষণ করার সুযোগ নেই, কিন্তু এইটুকু আমি বলতে পারি - অর্থনীতিবিদ অমিয়কুমার বাগচী যে কাঠামোকে বলছেন ভারতবর্ষের ২০০ বছরের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি, সেটা একেবারে অর্থনৈতিক ভাষ্য-সূত্র - এই ব্যাখ্যা ঐতিহাসিকদের আলোচনায় পাওয়া নামুমকিন বলেই স্বাভাবিকভাবেই ঐতিহাসিকদের লেখায় এই উল্লেখ পাই না। ইতিহাসচর্চা খুব

গুরুত্বপূর্ণ সেখানে, কিন্তু অর্থনীতির তাত্ত্বিকভিত্তি সেখানে উঠে আসে নি।

অশেষ - বুঝতে পেরেছি। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন এভাবে পেশ করি - তোমার এই প্রাক-উপনিবেশ উপনিবেশের বোঝাটা আমি বুঝতে চাইছি। মানে বাংলা বা সারা ভারতেও একাডিমিয়ার মধ্যে বামপন্থী, বিশেষ ভাবে বললে মার্ক্সিস্ট স্কুল অফ থটের এত জোরাল উপস্থিতি সত্ত্বেও, আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলায়, প্রাক-উপনিবেশিক থেকে ঔপনিবেশিক সময়ের ধারাবাহিকতা নিয়ে কাজ এত কম কেন?

বিশ্বেন্দু - আমি এক সময় মার্ক্সিয় ধারণায় খুবই প্রভাবিত ছিলাম। এবং সেই পড়াশোনা আমায় নানান সম্পর্ক বুঝতে, সমাজ বুঝতে, রাষ্ট্র ক্ষমতা বুঝতে, সমাজ-রাষ্ট্র টানাপোড়েন বুঝতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি আবার হকার কারিগর সঙ্গঠনে যখন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে কাজ করার সময়, বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা বোঝার চেষ্টার সময় মার্ক্স অনুগামীদের বিকেন্দ্রিভূত অর্থনীতি, স্মৃতিনির্ভর দর্শন বোঝার তাত্ত্বিক অবস্থানে ঘাটতি অনুভব করেছি। মার্ক্স অনুগামীরা বলেছেন পাঁচটা নির্দিষ্ট বিকাশের স্তর পার হয়ে সাম্যবাদে পৌছন সম্ভব - এই পথের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম উপনিবেশ। বিশ্ব ইতিহাস উপনিবেশ-পূর্ব সময় থেকে যখনই উপনিবেশে ঢুকছে, সে সময় ইওরোপিয় শক্তি নির্দেশিত পথে উপনিবেশেই শুধু নয়, মেট্রোপলিটনেও ইওরোপ পরিকল্পিত পরিবর্তন আসছে, যে পরিবর্তনকে অমিয় বাগচী 'কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি' বইএর ভূমিকার নাম দিচ্ছেন বিশ্বের প্রথম স্ট্রাকচারাল এডিজাস্টমেন্ট নীতি। মার্ক্স বলেছিলেন কোনও কিছুকেই প্রশ্ন করতে ভুলো না - তাঁর দেওয়া সূত্র অনুসরণ করেই আমরা জাতিরাষ্ট্র আর আমলাতান্ত্রিকতাকে প্রশ্ন করছি, উৎপাদনের কেন্দ্রিকতাকে প্রশ্ন করছি, ইওরোপ-আমেরিকায় পুঁজি সংহত হওয়ার প্রক্রিয়াকে প্রশ্ন করছি, প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞানচর্চাকে প্রশ্ন করছি। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় দেখলাম তাঁর অধিকাংশ অনুগামী প্রশ্ন করা ভুলে যান্ত্রিক মার্ক্সপন্থা আঁকড়ে ধরছেন, দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক বাস্তবতা, সামাজিক বাস্তবতাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমরা যাকে হকার-কারিগর-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থা বলছি, সে ব্যবস্থায় হাজার উৎপাদক, হাজার বিক্রেতা, হাজার ক্রেতা - যে উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্র নেই। আমাদের মনে হয়েছে মার্ক্স যে সাম্যের দিকে যেতে চেয়েছিলেন, এই ধরণের বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা সেই পথে যাওয়ার সক্রিয় বাহন হতে পারত। এই উৎপাদন ব্যবস্থা আলোচনায় মার্ক্সবাদীদের উৎসাহ দেখি নি। অমিয় বাগচী ১৯০ বছরের উপনিবেশকে স্ট্রাকচারাল এডিজাস্টমেন্ট হিসেবে আখ্যা দিচ্ছেন, অর্থাৎ উপনিবেশপূর্ব সময়ে যে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা এই অঞ্চলে ছিল, তাকে ধ্বংস করে কেন্দ্রিভূত কর্পোরেট কমান্ড অর্থনীতি চাপিয়ে দেওয়াকে সাচ্চা মার্ক্সবাদী হিসেবে প্রশ্ন

করলেন; কিন্তু এই উপনিবেশিক ধ্বংসক্রিয়ার ব্যাখ্যা অমিয়বাবুর বইগুলোর দুই মলাটে আটকে রইল তাত্ত্বিক প্রপঞ্চ হয়ে। আমাদের দায় আছে সেগুলোকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনা।

অমিয়বাবু উপনিবেশের কিছু নীতিকে স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট বলছেন না, বরং উপনিবেশকেই স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট আখ্যা দিচ্ছেন; তিনি জানেন উপনিবেশের মূল লুঠ প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল করা। সে লুঠ প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছেন উৎসা [পট্টনায়েক]। লুঠ নিয়ে ১০০ বছর আগে রমেশচন্দ্র দত্ত-দাদাভাই নৌরজী আজ উৎসা ছাড়া আর কাজ কই? দক্ষিণ এশিয়া থেকে মেট্রোপলিটনে যাওয়া সম্পদ লুঠের পরিমান আঁকছেন রামবাগানের রমেশ দত্ত - ৬৩০ মিলিয়ন পাউন্ড; উৎসার মতে এই অঙ্কটাই সেটলড ফ্যাক্ট। অথচ লুঠ নিয়ে বাম/মার্ক্সীয় পণ্ডিতেরাই একমত নন। ইরফান হাবিব 'ক্যাপিট্যালিজম ইন হিস্ট্রি'-তে বলছেন, ইংলন্ড বিদেশ থেকে বিপুল রাজস্ব আদায় করেছে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে খুব একটা দ্বিমত নেই - ১৮ শতের শেষের দিকে উইলিয়াম পিট দেখিয়েছিলেন অঙ্কটা বার্ষিক ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউন্ড। হাবিব মন্তব্য করছেন উপনিবেশ লুঠের অর্থ (তিনি ইনকাম বলছেন) শিল্পায়নে ব্যয় হয়েছে কি না, সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকেরা একমত নন এবং এটা নাকি অমিমাংসিত আলোচনা। তার মতে (ফিলিস) ডিয়ানে এবং (উইলিয়াম এলেন) কোল, উপনিবেশ থেকে সম্পদ লুঠ বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। তাদের মনে হয়েছে এ বিষয়ে বিশদ গবেষণা দরকার। মার্ক্সীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে লুঠ নিয়ে (মরিস) ডব 'স্টাডিজ ইন ডেভেলাপমেন্ট অব ক্যাপিট্যালিজম'এ চুপ থেকেছেন, (পল) সুইজি ডাউট-নোট দিয়ে বলছেন একিউমুলেশন কীভাবে ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োজিত হল সে বিষয়ে মার্ক্স-এর আলোচনা কম। ডবের বক্তব্য যারা প্রাইমারি একিউমুলেশন বিনিয়োগ করে জমিদারি কিনেছিল, সেই জমিদারেরা জমি বিক্রি করে শিল্পে বিনিয়োগ করেছে। সুইজি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন শ্রেণী কিনল, তখন তিনি উপনিবেশিক লুঠের কথা বাধ্য হয়ে বলেন। মাথায় রেখো, উৎসার গবেষণা উপাত্তর সঙ্গে অমিয়বাবু হেভিয়ার কুয়েনকা এস্তোবানের (JAVIER CUENCA ESTEBAN-এর The British balance of payments, 1772-1820: India transfers and war finance) তথ্য ব্যবহার করছেন। হাবিব বলছেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবসর নিয়ে পূর্ব ভারত থেকে ফিরে আসা কোম্পানির ধনবান আমলা 'নবোব'-দের বন্ড এবং রিয়েল এস্টেট বিক্রি করা বড় ব্যাপার ছিল। এদের উপনিবেশিক লুঠ থেকে অর্জিত সম্পদ শিল্প বিপ্লবে বিনিয়োজিত হয়। প্রাথমিক সঞ্চয়ের ইতিহাস চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়, ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রাথমিক কারন ছিল কৃষককুলের ধ্বংস আর উচ্ছেদ; দ্বিতীয় কারন

বিশ্বজোড়া উপনিবেশিক অর্থনীতির কলোনাইজেশন এবং বাধ্যতামূলক লুঠ। পুঁজিবাদের উদ্ভব স্বাভাবিক ইওরোপিয় দেশজ প্রক্রিয়া ছিল না। উপনিবেশ তৈরি না হলে শিল্প পুঁজি গঠন হয় না। উপনিবেশিকতা পুঁজিবাদের বিকাশে প্রাথমিক, মৌলিক, অনিবার্য পূর্বানুমান। ফলে অমিয়বাবুই দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দিককার উপনিবেশ চর্চা করা বামপন্থী অর্থনীতিবিদ, যিনি ব্রিটিশ শাসনকে শুধু লুঠেরাই বললেন না, ১৯০ বছরের উপনিবেশি শাসনকে স্যাপএর (স্যাপ অর্থে স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট পলিসি, বাম লব্জে গালিই) যুগ আখ্যা দিলেন। এঙ্গাস ম্যাডিসনের দক্ষিণ এশিয়ার জিডিপি হিসেব বাতিল করে অমিয় বাগচী বুকানন-কোলব্রুক-ল্যাম্বার্টদের সমীক্ষা নির্ভর করে নতুন আঁক কষলেন।

আরেকটা সমস্যা হল দক্ষিণ এশিয়ার উপনিবেশিক অর্থনীতি চর্চায়, পুঁজি সংহত হওয়াকে আবশ্যিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার প্রগতিশীল ক্রিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পুঁজি যেহেতু 'প্রগতির বাহন এবং সেকুলার', তাই পুঁজিই আরাধ্য। হকার-কারিগর-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার সমর্থকেরা পুঁজিকে সেকুলার ধরি না। তার অন্য চরিত্র আছে। তাই অমিয় বাগচী পুঁজি সংহত হওয়ার উৎসমূল, উপনিবেশের শিরে কুঠারাঘাত করেছেন - তাই তিনি অনন্য।

অশেষ - এটা যারা শুনছেন, তাদের জন্য পরিষ্কার করে যেটা বলা যায় যে - এমনকি শশী থরুর যে লুঠের তত্ত্ব নিয়ে কথা বলেছেন, বা লুঠকে বর্ণনা করেছেন, লুঠ-এর ফ্যাক্টরগুলোকে তুলে এনেছেন, সেটা বামপন্থীদের তরফ থেকে তেমন ভাবে শুরুতে, আমরা অন্তত দেখি নি - যেটা রিসেন্ট পাস্টে - রিসেন্ট পাস্ট বলতে দু হাজার বা নব্বই পরবর্তী সময় থেকে অধ্যাপক অমিয় বাগচী, অধ্যাপক উৎসা পট্টনায়করা কাজগুলো করেছেন।

বিশ্বেন্দু - এই নয়ের দশকের পরের সময় থেকে ২০২১-এত মাঝপথ পর্যন্ত লকডাউনে আইএমএফ/ওয়ার্ল্ডব্যাঙ্কের স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট পলিসিকে নতুন ডিজিটাল ব্যবস্থায় আবারও নগ্নভাবে রূপায়িত হতে দেখছি চোখের সামনে দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে। সেই ডিজিটাল পুঁজির রিসেট ২.০-র গর্ভগৃহে বসে অমিয়বাবুর সঙ্গে এই আলোচনা আমাদের নতুন পথ দেখাবে।

অশেষ - রাইট। তোমার সাথে কথাটা হয়ে গেলে, দর্শকদেরও জানিয়ে দিতে চাইবো আমরা আজকে কি কি বিষয়ে আলোচনা করব ভেবেছি। কিন্তু তার আগে তোমাকে যে শেষ প্রশ্নটা করি সেটা হচ্ছে যে, পারটিকুলারলি অধ্যাপক অমিয় বাগচীর কাজটাকে, উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় তুমি কোন জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছ, বিশেষ করে কারিগর অর্থনীতি এবং প্রাক-উপনিবেশ উপনিবেশকে বুঝতে।

বিশ্বেন্দু - তিন বছর পিছিয়ে যাই। প্রথম বই 'পলাশীর পূর্বে বাংলার ৫০ বছর' প্রকাশ

হওয়ার সময় আমি খুবই নিষিক্ত ছিলাম সুশীল চৌধুরীর কাজে - এখনও আছি। আমি তাঁর একলব্য শিষ্য। সুশীল চৌধুরীর 'ট্রেড এন্ড কমার্সিয়াল অর্গানাইজেশন ইন বেঙ্গল' এবং 'ফ্রম প্রস্পারিটি টু ডিক্লাইন' পড়েছি তন্ন তন্ন করে। অনুবাদ করার ইচ্ছে ছিল (কিন্তু প্রকাশক অনুমতি দেন নি)। পলাশী পূর্বের রাজনীতি নিয়ে মোটের ওপর সুশীলবাবুর তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের তত্ত্ব মিলছিল - বিশেষ করে কীর্তিনারায়ণ চৌধুরী বা পিটার মার্শাল বা ক্রিস বেইলি বা ওয়ারেলস্টাইনের গ্রেট ডাইভারজেন্স তত্ত্ব বা এশিয় অর্থনীতিকে শুধুই পেডলার্স অর্থনীতি হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার সমস্যাগুলো তুলে ধরা, উপনিবেশপূর্ব বাংলা নিয়ে কেম্ব্রিজ এবং অন্য ইওরোপিয় ইতিহাস আঙ্গিকের অপপ্রচারের উত্তর খোঁজা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট মনে হচ্ছিল। উপনিবেশপূর্ব সময়ের অর্থনীতি যেহেতু মূলত কারিগর চাষী হকার নির্ভর, এবং আমি মোটামুটি এই অর্থনীতিটা কিছুটা হলেও বুঝতাম - সেখানে আমার মনে হচ্ছিল তাঁর উপনিবেশ-পূর্ব সময়ে কারিগরি ব্যবস্থা ব্যাখ্যায় কিছু কিছু সমস্যা আছে। ওনার ছাত্র হাবিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে রেখেছিলাম, বই বের হলেই তাঁর কাছে গিয়ে একটা বড় ডাউট ক্লিয়ার সেসান আয়োজন করব। বাংলায় বিনা প্রশ্নে গুরুবাক্য মেনে নেওয়ার পরম্পরা ছিল না বলেই আমরা বহু নতুন নতুন তত্ত্ব, তথ্য, বিশ্লেষণ পেয়েছি। তাঁর সঙ্গে কি কি বিষয় আলোচনা করব, সেটা লিখেছিলাম, কিন্তু প্রথম বইতে সঙ্কোচবশত দিই নি। সেটা পরের বছরের 'পলাশীর পূর্বের বাংলার বাণিজ্য'-র ভূমিকায় রেখেছি। ২০১৯এর তিনি মারা গেলেন বই মেলার ঠিক আগে আগেই। এই অপূর্ণতার আফসোস আমার সারা জীবনেও যাবে না।

'পলাশীর পূর্বে বাংলার ৫০ বছর' প্রকাশ হওয়ার পরের বই, 'পলাশীর পুর্বে বাংলার বাণিজ্য'-র খসড়া তৈরির করার সময়, বা তার আগেও হয়ত হবে অমিয়বাবুর লেখা খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়ি নি। আলগোছে প্রবন্ধ, সমালোচনা পড়েছি। তার একটা বড় কারন ছিল উপনিবেশের সময় নিয়ে সাধারণভাবে বামেদের পুঁজি কেন্দ্রিক, শিল্পবিপ্লব পক্ষীয় ভাষ্য। সেই কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থা নির্ভর ভাষ্যের সঙ্গে আমাদের বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থার ভাষ্য মেলার সুযোগ ছিল না; ততদিনে ইরফান হাবিব এবং সার্বিকভাবে আলিগড় আঙ্গিক নিয়ে আমি সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়ম বা সুমিত গুহদের (সেটা ২০২০তে হবে) মত অনুসরণ করছি। সঞ্জয় দেখিয়েছেন হাবিব আদতে সাম্রাজ্যবাদী মোরল্যান্ডের তত্ত্ব ভিত্তি করে নিজের কাজ এগিয়ে নিয়েছেন।

একদিন জেদ করে অমিয়বাবুর বইটার ভূমিকাটা পড়ে নিজেকে গালি দিলাম কেন এত দিন বইটা পড়ি নি - তখন থেকেই সিদ্ধান্ত নিলাম খুব গভীর ভাবে তাঁর লেখাপত্র - বিশেষ করে তাঁর উপনিবেশের অর্থনীতি, পুঁজি সংহত হওয়ার

প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের ধারাগুলো অধ্যয়ন করব। 'কলোনিয়ালজিম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি' দিক বদল করে দেওয়ার মত বই। অমিয়বাবু বই-এর মুখড়া করছেন অর্থনৈতিক সুত্র স্ট্রাকচারাল আডজাস্টমেন্ট উল্লেখ করে - এবং সেই সূত্রে উপনিবেশিক কাঠামো, লুঠ-খুন-অত্যাচারের প্রকরণ আমাদের সামনে উদোম হয়ে যায়। তিনি নির্দিষ্ট ভাবে বলছেন ভারতে আইএমএফ-এর স্ট্রাকচারাল আডজাস্টমেন্টের যে পলিসি নয়ের দশকে অনুসৃত হয়েছিল, তারই প্রতিফলন হচ্ছে এই দু শতকের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে। এই ব্যাখ্যাটাই মিস করছিলাম।

এছাড়াও অমিয়বাবু আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরেছেন। আমরা উপনিবেশপূর্ব সময়ের অর্থনীতির ওজন মাপতে সাধারণত অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসনের তৈরি জিডিপি সুত্র নির্ভর করি। কিন্তু আজ প্রমানিত অর্থনীতি বুঝতে জিডিপি নির্ভরযোগ্য সূত্র নয়। তিনি যখন এই কাজটা করছেন, সে সময় উপনিবেশ নিয়ে ইরফান হাবিব ছাড়া অন্য তথ্যভাণ্ডার খুব একটা ছিল না। ফলে এঙ্গাস ম্যাডিসনের মাপন কতটা নির্ভরযোগ্য সেই প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ বা তার পালটা তথ্য দেওয়ার হাতিয়ার আমাদের হাতে ছিল না। আমি অন্তত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষকদের অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসনের মাপন সূত্রকে প্রশ্ন করতে দেখি নি। এই বইতে অমিয়বাবু শুধু অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসনের তৈরি জিডিপি অঙ্ককেই প্রশ্ন করছেননা, খুব কঠোর ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন তাঁর কাজের খামতিগুলো।

এর সঙ্গে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক অবস্থানের কথাও বলা দরকার। 'যদ্যপি আমার গুরু'তে রজ্জাক সাহেবের সঙ্গে আলাপচারিতায় আহমদ ছফা বলছেন, ব্রিটিশপূর্ব সময়ে বাংলার গ্রামীন ব্যবস্থার সঙ্গে কোনওভাবেই ইওরোপিয় সামন্ততন্ত্রের তুলনা করা উচিত না [আলাপচারিতার শেষে ২ নং সংযোজনে গুরু-শিষ্যের প্রাসঙ্গিক আলাপ উল্লেখ করেছি] রাজ্জাক সাহেবের দেওয়া সহজসরল রাস্তায় অমিয়বাবু যোগ্য সূত্র দিয়ে অর্থনীতি বিশ্লেষণ করছেন। আমিয়কুমার বাগচী বলছেন, পলাশি পূর্ব সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগ এবং মুদ্রা কনভারটেবিলিটি - এই দুটোই রাষ্ট্র কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করলেও বাজারকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করত না। ফলে, একটা সাম্যাবস্থা তৈরি হয়েছিল। আর জমি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত এবং জমিতে ব্যক্তি মালিকানাও ছিল। জমির মালিকানা, হস্তান্তর, উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের পক্ষে কঠোর আইনগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। এইখান থেকে আমরা দেখতে পাই সামন্ততন্ত্রের ব্রিটিশপূর্ব সময় নিয়ে যে সব তাত্ত্বিক অবস্থান তৈরি হয়েছে, সেইটা ছফা-রাজ্জাক সাহেবের মত সরাসরি নস্যাৎ করছেন না, পরখ করে দেখছেন। ইরফান হাবিব হোক, আতহার আলিই হোক বা নুরুল হাসানই হোক - যারা সামন্ততন্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন অতীতে, অমিয়বাবুর বই পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, কোথাও একটা তিনি এই সব পণ্ডিত মানুষদের পরোক্ষ সমালোচনা এখানে করছেন। এটা

আমাদের খুব বড় পাওনা- বিশেষকরে একজন বামপন্থী, মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিকের থেকে। আর হাজারও কথা বলা যায় - কিন্তু এই তিনটে পয়েন্ট আমাদের মত উপনিবেশচর্চাকারীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তার এই তিনটি সুত্রের জন্য নতজানু হই আমিয় বাবুর কাছে। 'কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি' অসামান্য বই। তাঁর সঙ্গে মৃদুলা মুখার্জী, উৎসা পট্টনায়ক, প্রভাত পট্টনায়ক অসামান্য কাজ করেছেন।

অশেষ - অনেক ধন্যবাদ বিশ্বেন্দুদা। সম্ভবত আজকের আলচনাটা কেন এবং তার প্রাসঙ্গিকতাটা, যেটা আমরা ব্যাখ্যা করতে চাইলাম এটার মধ্যে দিয়ে, আমরা হয়ত আমাদের প্রয়োজনটা বা আমাদের ভাবনাটাকে পরিষ্কার করে রাখতে পেরেছি। আলোচনা শুরু হওয়ার আগে দর্শক-শ্রোতা যারা আছেন, তাদের জন্য আমরা যে ভাবে আজকের আলোচনাকে ভেবেছি, সেটা একটু বলে দিতে চাই। মূলত 'কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি' প্রবন্ধের সঙ্কলন। বইটা প্রকাশ হয় ২০১০-এ, যেখানে স্পষ্টভাবে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের উচ্চারণটা আমরা পাচ্ছি, যদিও প্রবন্ধগুলো তার আগে দেড় দশক ধরে লেখা। এই বইটা থেকে আমরা প্রথম যেটা বুঝতে চাইব, তা হল - অধ্যাপক বাগচী গোটা উপনিবেশের সময়কে তিনটে ভাগে ভাগ করেছেন, একটা ১৭৫০ পর্যন্ত, তার পরে কোম্পানির শাসন, তার পরে রাণীর শাসন। এবার এই সময় শেষ দিকটায় একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে ওনার যেটা মূলত ব্যাঙ্কিং হিস্ট্রি নিয়ে, স্টেট ব্যাঙ্কের হিস্ট্রি নিয়ে - যে পুঁজি কী করে তৈরি হল। আমাদের এখানে একদা উপনিবেশ তৈরি হল এবং তার পরে কিভাবে উপনিবেশ থেকে আদায় করা একটিও পয়সা উপনিবেশিক ভূখণ্ডে ব্যবহার না করে কি ভাবে উপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থার মাথায় চড়ে বসল। এই গোটা হিসেবকে উনি খুব পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছেন।

আজ আমরা যেটা ওনার কাছ থেকে বুঝতে চাইব, সেটা হচ্ছে, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব বা শিল্প পুঁজির গোটা ঘটনাটার বেশির ভাগই, হয়ত পুরোটাই উপনিবেশ থেকেই স্পন্সর করা হয়েছে, এভাবেই আমরা বলতে পারি কি না। লগ্নিপুঁজির আজকের সংকটের সময়ে, উপনিবেশের বা প্রাক-উপনিবেশের এই চর্চাটা আমাদের কাছে যে কারনে গুরুত্বপূর্ণ, সেই ধারাবাহিকতাটাকে উনি কি ভাবে দেখেন, সেটা প্রথমে আমরা বুঝতে চাইব।

দু'নম্বর যেটা আমরা বুঝতে চাইব সেটা হচ্ছে, এই যে বিশ্বের প্রথম কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস [বা রিসেট ১.০] - এই উপনিবেশের দুই শতক, সেই কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কি নব্বই পরবর্তী আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার নির্দেশিত যে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস অর্থেই ব্যাবহার করেছেন নাকি আর কোনও জেনেরিক, বিগার, বিয়ন্ড দ্য টার্ম মানে আছে? বিশ্বেন্দুদা কথা বলার সময় একটা কথা বলেছেন

সেটা হচ্ছে যে অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসনের যে জিডিপি এস্টিমেট, যে তাত্ত্বিক অবস্থানকে উপনিবেশ বিরোধী চর্চার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এমনিতেও ইতিহাসে কাউন্টার করা হত, সেটাকে অধ্যাপক আমিয় বাগচীও কাউন্টার করেছেন মুলত কোলব্রুকের ডেটাকে ধরে। যে ডেটাকে ধরে উনি যে কাজটা করেছেন, তাতে জিডিএমপি - গ্রস ডোমেস্টিক মেটিরিয়াল প্রডাক্ট বলে একটা ধারণা এনেছেন। আমরা এই ধারণাটা একটু ওনার কাছ থেকে বুঝে নিতে চাইব - যে উনি এই জিডিএমপি-র ধারণাটা কি ভাবে ব্যাখ্যা করছেন এবং ম্যাডিসনের যে জিডিপি এস্টিমেট প্রাক-উপনিবেশ ও উপনিবেশের সময় কে ধরে, সেটা কে উনি কি ভাবে কাউন্টার করছেন।

এর পরে যেটা সেটা খানিকটা উপনিবেশ বিরোধী চর্চাতে খুব বেসিক প্রিমাইস বলে মনে হয় - সেটা হচ্ছে পলাশী। পলাশীর ঘটনাটাকে যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় - সিরাজ-উদ-দৌলা খুব খারাপ লোক ছিলেন, ব্রিটিশরা এসে একটা খুব খারাপ লোককে শায়েস্তা করল - এবং তারা আমাদের ভালোর জন্যই এই কাজটা করলো - এই ন্যারেটিভের উলটো দিকে, যদি আমরা দেখি অধ্যাপক বাগচী অর্থনৈতিক ইতিহাসকে যেভাবে দেখেছেন, ১৭৫০ পর্যন্ত ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কারবারি হয়ে ওঠার চেষ্টা, এবং ১৭৫০ পরবর্তী, আসলে ১৭৪০ এর সময় থেকেই যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে, তার পরিণতিতে পলাশীর যুদ্ধর মত একটা ডিসিসিভ যুদ্ধ ছাড়া, এই কন্ট্রোল শুধু অর্থনৈতিকভাবে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না, সম্ভবত সেই কারনেই পলাশীর যুদ্ধই একমাত্র পরিণতি ছিল [পলাশীপূর্ব সময়ে কোম্পানির কাজকর্মকে সুশীল চৌধুরী সাব-ইম্পিরিয়ালিজম বলেছেন]। উল্টো দিকে সিরাজ-উদ-দৌলা না থেকে, মির জাফর থাকলেও ব্যাপারটা ওরকমই হত। সে ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি এখানে ইম্পরট্যান্ট নয়। ব্যক্তি সিরাজ-উদ-দৌলা নিয়ে চর্চার অন্য প্রাসঙ্গিকতা থাকতে পারে, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের প্রাসঙ্গিকতায় সিরাজ-উদ-দৌলা লোক কেমন ছিলেন সেইটা মোটামুটি নন-ইস্যু। বরং যেটা ভাবা যেতে পারে, সিরাজ-উদ-দৌলা ওই চ্যালেঞ্জটা তৈরি করতে পেরেছিলেন, বা আলিবর্দির চ্যালেঞ্জটাকে উনি কন্টিনিউড করতে পেরেছিলেন। তাই এটা নিয়ে ওর দৃষ্টিভঙ্গি আমরা একটু বুঝতে চাইব।

আর যেটা, মুলত বিশ্বেন্দুদা কথা বলার সময় বললেন, যে ইরফান হাবিবের একটা বই ‘এসেজ ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্র টুওয়ারডস এ মার্কসিস্ট পারসেপসন’, এটার রিভিউ আর্টিকলটা লিখতে গিয়ে অধ্যাপক আমিয় বাগচী যে আর্টিকেলটা লিখেছিলেন, সেই প্রবন্ধটা ’৯৬-এ লেখা হয়েছিল। আর্টিকলটার নামটাই খুব ইম্পরট্যান্ট আমার কাছে, ‘রাইটিং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ইন এ মার্কসিস্ট মোড ইন এ পোস্ট সোভিয়েত ওয়ার্ল্ড’। সম্পূর্ণ একটা এপিস্টেমলজিকালি নতুন এন্ট্রি পয়েন্ট

তৈরি করলেন যেটা অন্টোলজিকালি ডিফাইন্ড। মানে এই ব্যাপারটা আমাদের কাছে ভীষণ নতুন করে এল - যে পোস্ট সোভিয়েত ওয়ার্ল্ডে যখন মার্ক্সবাদ বা বামপন্থা সম্পর্কে প্রশ্নগুলো এক রকম ভাবে আমাদের কাছে আসছে, তখন আমরা কি ভাবে ভারতের ইতিহাসকে দেখতে চাইব ওই মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই সময়ে মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটা ঠিক কিভাবে ব্যখ্যা করতে পারি? কোথায়, কিভাবে তাকে প্লেস করব?

তো এই প্রাসঙ্গিকতায় আমি বিশ্বেন্দুদাকেও যে প্রশ্নটা করলাম যে বামপন্থী রাজনীতির পরিসরে প্রাক-উপনিবেশকে দেখা, উপনিবেশিক ইতিহাসকে দেখা এত কম কেন? বা তার কোনও নির্দিষ্ট কারন আছে বলে তিনি মনে করেন, না জাস্ট একটা ঘটনা স্রেফ ঘটে যাওয়া? কারন 'কলোনিয়ালিজম এন্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি'-তে উনি [অমিয় বাগচী] নিজেও মার্ক্সবাদী স্কুলের একটা অংশ যারা উপনিবেশকে বা সাম্রাজ্যবাদকে প্রগতিশীল বিষয় বলে মনে করেছিলেন, তাদেরকে যথেষ্ট নিন্দে-মন্দ করেছেন, গালাগালি করেছেন, আক্রমণ করেছেন, অনেক অপমান করেছেন। যেমন বিল ওয়ারেন তাদের মধ্যে একজন যারা মনে করেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদ ভারতের জন্য ভীষণ প্রয়োজনীয় এবং প্রগতির পক্ষে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তো বটেই। মানে এই যে প্রগতিকে দেখার মার্ক্সিয় ধারণাকে একটা অংশ মনে করেন এবং সেটা দিয়ে ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেন, সেটা একটা বায়াস তৈরি করে সম্ভবত। করে কি করে না, করলে কি ভাবে করে, তার উল্টো দিকটা কি, বামপন্থার পরিসরে সেটা নিয়ে আলোচনার কতটা জায়গা থাকতে পারে সেটা আমরা অধ্যাপক বাগচীর কাছ থেকে জানতে চাইব। এবং শেষত, আজকে যখন আমরা এই আলোচনাগুলো করতে চাইছি, আমরা নিজেরা জানি যে আমরা শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট পারস্যু করার জন্য এটা করছি না। বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে, গণআন্দোলনের প্রয়োজনে এই আলোচনাটা আমরা প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। এই প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক বাগচীর দৃষ্টিভঙ্গিটাও বুঝতে চাইব। আজকের সময় দাঁড়িয়ে এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতাকে অধ্যাপক বাগচী কি ভাবে দেখেন।

আজকের আলোচনাকে আমরা যে ভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি, সেটা আপনাদেরকে বললাম। এর পরে যদি আপনাদেরও কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে, এবং আপনারা যদি সেই প্রশ্নটা রাখতে চান, তাহলে সেই প্রশ্নটা ফেসবুকে কমেন্ট বক্সে দিতে পারেন, আমরা চেষ্টা করব প্রশ্ন নিতে। কিন্তু, আলোচনাটা যে ভাবে বাঁধা হয়েছে, তাতে এই সুযোগ কতটা থাকবে, সেটা আগে থেকে বলতে পারছি না। কিন্তু, যদি প্রাসঙ্গিক হয়, যদি আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হয়, আমরা অবশ্যই প্রশ্নটাকে রাখার চেষ্টা করব। আপাতত আমরা অধ্যাপক বাগচীর জন্য অপেক্ষা করছি। আশা করছি আর দু-এক মিনিটের

মধ্যেই ব্যাপারটা শুরু করতে পারব, অনলাইন হতে পারব। আমাদের একটু সময় দেবেন।

[অমিয়কুমার বাগচী আলোচনায় যোগ দিলেন]

অশেষ - নমস্কার। আমি অশেষ সেনগুপ্ত । আমার সঙ্গে আছেন বিশ্বেন্দুদা।

বিশ্বেন্দু - নমস্কার। আমি বিশ্বেন্দু নন্দ।

অশেষ - বিশ্বেন্দুদা প্রাক-উপনিবেশ সময় নিয়ে একটা দীর্ঘ গবেষণার সাথে যুক্ত এবং বিশ্বেন্দুদাই হচ্ছেন সেই মানুষ যিনি আপনার এই কয়নেজটা কে সব থেকে বেশি ব্যাবহার করতে শুরু করে আমাদের কাছেও পরিচিত করেছেন - যে, বিশ্বের প্রথম কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস হচ্ছে দুই শতকের ভারতীয় উপনিবেশ।

প্রথম প্রশ্নটা স্যার যদি এভাবে বলি, ইংল্যান্ডের শিল্পপুঁজি সংহত হওয়া সম্ভব হয়েছে এশিয় অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করে আর আফ্রিকা-আমেরিকায় দাস সম্পদ লুঠ করে, এটা কি আপনি একটা ঠিক স্টেটমেন্ট মনে করেন? লগ্নিপুঁজির আজকের সংকটের সময়, উপনিবেশ এবং প্রাক-উপনিবেশ সময়ের চর্চাটা কি শুধুই অ্যাকাডেমিক আগ্রহের বিষয়? না কি এটা আজকের সময়কেও চিনতে বুঝতে সাহায্য করবে?

আমিয়কুমার বাগচী - প্রথম কথা হচ্ছে, যে সাম্রাজ্যবাদ আমরা আলোচনা করাছি, সেটা হচ্ছে ধনতন্ত্রের আমলের সাম্রাজ্যবাদ। এটা না বুঝলে নতুন সময়ের সাম্রাজ্যবাদকে বোঝা যাবে না। কারন তার আগেও অনেক সাম্রাজ্য হয়েছে, মোঘল সাম্রাজ্য হয়েছে, চন্দ্রগুপ্তও মৌর্য আফগানিস্তান অবধি অধিকার করেছিলেন, চোলরা ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়াতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সে সাম্রাজ্য লাভের জন্য তৈরি করা হয় নি। এখনকার, ইংল্যান্ডের যে সাম্রাজ্যবাদ, সেটা হচ্ছে লাভের জন্য - পাওয়ার ফর প্রফিট অ্যান্ড প্রফিট ফর পাওয়ার। এইভাবে জিনিসটাকে বুঝতে হবে। এটা ভারতবর্ষ অধিকার করার আগেই ওখানেই উপনিবেশ ভেতরের থেকে তৈরি হয়েছিল, সপ্তদশ শতাব্দতে তারা সামন্ততন্ত্রকে ভাঙতে শুরু করলে। ভাঙ্গনটা শেষ হয়েছিল সিভিল ওয়ারের পরে, ১৬৪০ এর দশকে। তারপর থেকেই সেখানে ধনতন্ত্রের বিকাশ হতে আরম্ভ করে।

কিন্তু, এই যে ধনতন্ত্রের ভিত্তি যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই তারা অন্য দেশের ওপরে ক্ষমতা খাটানোর চেষ্টা করেছে এবং অন্য দেশ থেকে ধনরত্ন এবং লেবার যোগাড় করে নিজেদের দেশ এনেছে। দাসদেরকে ইওরোপে নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল পর্তুগিজরা। ইংলন্ড দাস ব্যবসার মধ্যে ঢুকেই হয়ে উঠল বিশ্বের সব চেয়ে বড় দাস ব্যাবসায়ী। আফ্রিকা থেকে প্রায় বারো কোটি লোক

ওরা আমেরিকায় নিয়েগেছিল। সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল - অর্থাৎ প্রথম দিকে ওদের ক্যারেবিয় দ্বীপগুলো দাসদের দিয়ে কাজ করিয়ে লাভ তৈরি করত। তারপরে তারা ভারতবর্ষে দখল করল। সেটা হয়ে উঠল ওদের সব থেকে বড় লাভের জায়গা। ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, আগেকার অনেক ঐতিহাসিক বলতেন এটা একটা এক্সিডেন্টাল ব্যাপার। মোটেই না! বহুদিন থেকে ওরা চেষ্টা করছিল। ভারতবর্ষে ১৬৮৬ সালে আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য অ্যাটাক করেও পরাস্ত হয়েছিল। তার পর থেকে ওরা ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করে এবং সেইটা মাত্রা পায় যখন সিরাজ-উদ-দৌলার মত একজন অপরিণত বয়স্ক - তিনি মানুষ ভালো ছিলেন কি না, সেটা আসল প্রশ্ন নয়, কথাটা হচ্ছে ওনার যে দাদু আলিবর্দি খানের মতন সিরাজের পাকা বুদ্ধি ছিল না। এবং ওকে সেনাপতিরা মানত না, যার জন্যে ক্লাইভের পক্ষে তাকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল। তার পর থেকে ভারতের যে সম্পদ তারা লুঠ করেছিল, তাই দিয়ে তাদের ধনতন্ত্রের বিকাশ প্রচুর ভাবে হয়েছিল এবং শুধু নিজের দেশে তো তারা এই সম্পদগুল নিয়ে যেত তা নয়, বাংলার সম্পদ নিয়ে যেত ভারতের অন্য জায়গা দখল করতে - যেমন মারাঠাদের বিরুদ্ধে বা টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে।

এদের আরও কতগুলো দায় ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন অঞ্চল দখল নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু কোম্পানিকে (তার শেয়ারহোল্ডারদের) ডিভিডেন্ড দিতে হত। এবং যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিপদে [আর্থিক সংকটে] পড়ল ১৭৭৬ সালে, তখন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট [লাভের] অংশ দাবি করল। কাজেই ভূমি রাজস্বটা কোম্পানির দরকার পড়েছিল তিনটে কারণে। একটা হল অন্য অঞ্চল দখল করার জন্য ব্যয়, অন্যটা হল [শেয়ার হোল্ডারদের] ডিভিডেন্ড দেওয়ার জন্য ব্যয়, তৃতীয়টা হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে খুশি রাখার জন্যে অর্থ। শুধু ভারতবর্ষকে যে তারা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অঞ্চল দখল করার জন্যে ব্যাবহার করেছিল তা নয় - আফিম যুদ্ধ যখন হয়েছিল, সেই যুদ্ধে সফল হতে বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবহার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। আফগান যুদ্ধ যে কটা হয়েছে, প্রথম আফগান যুদ্ধ, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, অতি বদমাইশ একটি গভর্নর জেনারাল ছিল লর্ড লিটন, তখন ভারতবর্ষে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়, সেই দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ভারতের সম্পদ দিয়ে তারা আফগান যুদ্ধ করেছিল। শুধু যে এখানে যুদ্ধ করেছিল এমন নয়, চিনে বক্সার বিদ্রোহ দমন করতে হলে তখনও যে সম্পদ দরকার, সেটাও ভারত থেকে নিয়েছিল। আবিসিনিয়াতে যুদ্ধ করেছিল তারা, সেই অর্থ ভারত থেকে নিয়েছিল। আমাদের বুঝতে হবে যে, এটা ছিল ধনতন্ত্রের সময়ের সাম্রাজ্যবাদ, যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশ থেকে জিনিস লুঠ করে নিজেদের দেশে নিয়ে যাওয়া, অথবা অন্য জায়গায় লুঠ করে

নিয়ে গিয়ে তা বিনিয়োগ করে আরও বেশি লাভ করা।

আমি দেখিয়েছি, যে ১৯১৩ সালে, ব্রিটেন ছিল পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি বিদেশী লগ্নির দেশ এবং সেই বিদেশী লগ্নি কিন্তু ভারতবর্ষে আসে নি। এখানে [সাম্রাজ্য চালাতে] মাছের তেলেই মাছ ভাজা হয়েছিল। কিন্তু ইংলন্ডের সব থেকে বেশি বিনিয়োগ গিয়েছে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকায়, আর তার পরে ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডে। এবং চার হাজার মিলিয়ান পাউন্ড ওরা [বিভিন্ন দেশে] বিদেশী লগ্নি করেছিল, সেই বিনিয়োজিত অর্থের প্রায় পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ এসেছিল ভারতবর্ষ এবং বার্মা থেকে। সুতরাং, ভারতের সম্পদ দিয়ে আজকে আমেরিকার এত রমরমা - এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আর এই যে 'কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস' শব্দবন্ধ বলেছেন, এটা কিন্তু প্রথম ব্যাবহার করেছিলেন সমীর আমিন ['উন্নত এবং প্রভাবশালী দেশের চাহিদা অনুযায়ী অনুন্নত দেশগুলোর কাঠামো সাজিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া অনুন্নয়ন'] ১৯৫৭য়। এবং এই যে কাঠামোগত বদল হচ্ছে, সেটা যে হচ্ছে শুধু অর্থনীতির কাঠামো বদলানো করার জন্য নয়, সমাজকেও বদল করার জন্য। আগে জমিদারদের যে দায়িত্ব ছিল, ব্রিটিশ উপনিবেশ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সে দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিল। তার ফলে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হল বিহারের। কারন সেখানে এক দিকে পাটনা ছিল আগে আলিবর্দির জায়গা, মুর্শিদকুলি খানের আমলে তার ফলে পাটনার যে একটা ক্যাপিটাল সিটি হিসেবে সমৃদ্ধি ছিল সেটা কমে গেল। এবং আরও একটা ঘটনা ঘটল, বুকানন হ্যামিলটনের বইটিতে দেখা যায় যে উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও, প্রচুর জায়গাতে তখনও বস্ত্র শিল্প ছিল - পাটনা, গয়া, সাহাবাদ অঞ্চলে। সেগুলো সব নষ্ট হয়ে গেল।

আর একটা ঘটনা ঘটল, আমাদের দেশে আগে কিন্তু জমিদারদের কতগুলো দায়িত্ব নিতে হত। তারা লোকাল পুলিশ দেখত, বিচার ব্যাবস্থা দেখত এবং তাদের দায়িত্ব ছিল সাধারন মানুষের খানিকটা দেখভাল করা কারন তাদের উপরে জমিদারদের রেভেনিউ নির্ভর করত। এখন যেটা হল যে, ওরা ব্রিটিশ ট্রেজারিতে একটা খাজনা দিয়ে দেয়, কিন্তু তাদের অন্য দায়িত্ব পালন করতে হল না। ফলে একটা অত্যন্ত অত্যাচারী এবং আনপ্রডাক্টিভ জমিদার ক্লাসের জন্ম হল। সেই ভাবেই তাদের কালচারও বদলে গেল। উত্তরপ্রদেশে তালুকদার, রাজপুতেদের এত রমরমা হল, সেটা কিন্তু ১৮৫৭ সালের পরের ঘটনা। ব্রিটিশরা দেখল এই তালুকদাররা সিপাহিদেরকে ভাল লিডারশীপ দিয়েছে, তখন তাদেরকে তুষ্ট করার জন্য এটা করল। একটা সম্পূর্ণ অত্যাচারী শ্রেণীর জন্ম হল, তার চেহারা আজকের যোগী আদিত্যনাথের মধ্যে খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি।

অশেষ - স্যার, এখানে আরও একটা প্রশ্ন করে নিই - সেটা হচ্ছে এই যে কাঠামোগত

পুনর্বিন্যাস কথাটা আপনি বলেছেন, যেটা আপনি এর আগে বললেন যে প্রথম কয়নেজটা হয়েছে ষাটের দশকের আগে, মানে পঞ্চাশের দশকের শেষ ভাগে। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কাঠামগত পুনর্বিন্যাস নব্বইয়ের দশকে ইন্টারন্যাশানাল মনিটারি ফান্ড লেড যে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট, এইটা যখন আমরা চিনছি, আর এই যে উপনিবেশের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস আপনি রেফার করছেন, এই দুটো কি সম্পূর্ণ এক অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে, না কী অর্থটাও কোথাও পালটাচ্ছে?

আমিও - অর্থ খানিকটা হয়ত পালটাচ্ছে, কিন্তু খুব বেশি পালটাচ্ছে না। দুটোরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিকে স্কুইজ করা, টুঁটি চেপে ধরে তার থেকে যতটা পারা যায় একটা উদ্বৃত্ত যোগাড় করে নেওয়া। সেটা আগে সাম্রাজ্যবাদীরা করত, এখন সেটা করছে আইএমএফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি। মনমোহন সিংহর আমলে এই একইভাবে কাঠামো পরিবর্তনের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। তার মধ্যেও দু'একটা ভালো জিনিস ছিল। আমি কোনদিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্সিং রাজকে সমর্থন করি নি, কিন্তু ক্যাপিটালিস্ট মার্কেটের উপরে কন্ট্রোল রাখা জরুরি প্রয়োজন ছিল; আর দরকার ছিল যে সব নতুন প্রাইভেট সেক্টার ব্যাঙ্কগুলো আসছে, সেগুলোকে স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। মনমোহন সিংহ গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ককে খুব ফলাও করে উদ্বোধন করলেন, দু'বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কটা পড়ে গেল। এবং তখন, ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স দিয়ে গ্লোবাল ট্রাস্ট ব্যাঙ্ককে আবার অধিগ্রহণ করাতে হল।

অশেষ - এখানে একটা টেকনিকাল প্রশ্ন করে রাখি। আপনি কোলব্রুকের ডেটা বার বার রেফার করেছেন 'কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি' বইতে। এই বইতে কোলব্রুকের ডেটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসন যে জিডিপির মাপ করেছিলেন সেটাকে সরাসরি আপনি সমালোচনা করেছেন। আমরা প্রথমত আপনার তৈরি করা গ্রস ডোমেস্টিক মেটেরিয়াল প্রোডাক্ট (জিডিএমপি) এই ধারণাটা একটু বুঝতে চাইব আর সেখান থেকে ম্যাডিসন এবং ম্যাডিসনের ধারণাকে আপনি কোথায় কোথায় কাউন্টার করছেন সেটা যদি একটু বুঝিয়ে দেন।

অমিয় - ম্যাডিসনের প্রব্লেম হচ্ছে যে উনি কোনও প্রাইমারি ডেটা দেখেন নি। ওনার সমস্ত কাজ বিভিন্ন লোকের সেকন্ডারি ডেটা থেকে তৈরি হয়েছে। ফলে ওনার মাপদণ্ড তৈরি করার প্রসেস ক্রিটিসাইজড হয়েছে। জিডিএমপি হচ্ছে মেটিরিয়াল প্রোডাক্ট, অর্থাৎ এগ্রিকালচার এবং ইন্ডাস্ট্রির মোট আউটপুট। আমি সারভিসেসটা ধরি নি, কারন সারভিসেস একটা প্রিইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিতে সে ভাবে সেপারেটেড হয় না। এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডোমেস্টিকালি প্রডিউসড হয়, অথবা প্রডাকশানের সাথেই জড়িয়ে থাকে। সুতরাং অনেক

বেশি রিলায়েবেল হল জিডিএমপিটাকে ধরা। এবং কোলব্রুকের ডেটা আমি এখানে ব্যাবহার করেছি কারন কোলব্রুক এই অঞ্চলের ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টার ছিলেন। তিনি প্রাইমারি ডেটা কালেক্ট করেছেন, তিনি এবং তাঁর সহযোগী ল্যাম্বার্ট যে তথ্য দিয়েছিলেন সে সব অন্য যে কোনও লোকের দেওয়া তথ্যের তুলনায় মোর রিলায়েবল।

অশেষ - স্যার এর পরে যে প্রশ্নটা করব ভেবেছিলাম আপনি তার উত্তর অনেকটাই আগেই দিয়ে দিয়েছেন। মানে সিরাজ-উদ-দৌল্লা মানুষ ভালো ছিলেন কি না, এবং সেটা পলাশীর যুদ্ধের কারন তো নয়ই, পলাশীর যুদ্ধের কারনের একটা বাধ্য-বাধকতা তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে। আমি বরং প্রশ্নটাকে একটু অন্য ভাবে রাখি যেহেতু আপনি মার্ক্সিয় রাজনীতির ধারণাতে বিশ্বাস রেখে আপনার কাজটা করেন বা আপনার কাজটাকে নিয়ে আপনার একটা নির্দিষ্ট [তাত্ত্বিক] অবস্থান আছে - মানে, এটা কি কখনও আপনার মনে হয়েছে যে মার্ক্সিয় রাজনীতির চর্চায় বা এভারেজ বামপন্থা চর্চায় আমাদের ভারতবর্ষে বা পারটিকুলারলি বাংলায়, অ্যাকাডেমিয় বামপন্থা বা মার্ক্সিস্ট স্কুল অফ থটের তো একটা প্রাধান্য আছে - সেখান থেকে কখনই এই উপনিবেশ বা প্রাক-উপনিবেশের সময়টাকে ঠিক ভাবে চর্চা করা হয় নি, বরং কোথাও কোথাও, যেটা আপনি 'কলোনিয়ালিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ইকনমি'-তে বলেওছেন, যে বিল ওয়ারেনের মত কেউ কেউ [স্বঘোষিত মার্ক্সবাদী], যারা সাম্রাজ্যবাদের ফলে ভারতবর্ষের জন্য উপনিবেশ তৈরি হওয়াটাকে প্রগতির চিহ্ন বলে অভিহিত করেছিলেন - এই উপনিবেশিক প্রগতির ধারণা একাডেমিয়ায় আজও ব্যাপ্ত রয়েছে। এটা কি ভাবে হওয়া সম্ভব হল? মানে, সমস্যাটা ঠিক কোথায় হচ্ছে মার্ক্সিয়ান ডিস্কোর্সে?

অমিয় বাগচীঃ সমস্যাটা সোভিয়েত [একাডেমিয়ার] ব্যাখ্যায় তৈরি হয়েছে। মার্ক্সের কোথাও ইউনিলিনিয়ার প্রোগ্রেসের ধারণা একেবারেই নেই। উনি একবার এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশানের কথা বলেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেটা [এই বাক্যাংশ পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে না]। মুশকিল হল সোভিয়েত একাডেমিয়ারা তাঁর ওই বক্তব্যটাকে একটা লিনিয়ার স্ট্রাকচার ভেবে নিল। পুরো ইওরোপে এন্সিয়েন্ট স্লেভারি থেকে ফিউডালিজমে এল, আর ফিউডালিজম থেকে ক্যাপিট্যালিজম এল। এশিয়াতে সেই প্রগ্রেশানটা সম্ভব হল না কারন এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশান সেই প্রোগ্রেশনকে সম্পূর্ণ ভাবে আটকে দিল। এবং এর একটা সব চেয়ে এক্সট্রিম এবং ডিস্টর্টেড ফরমুলেসান ছিল উইটফোগেলের হাইড্রোলিক সোসাইটি/সাম্রাজ্য [জল নির্ভর সাম্রাজ্য, যা জল নির্ভর স্বৈরাচার, জল নির্ভর সমাজ, জল নির্ভর সভ্যতা, বা একচেটিয়া জল নির্ভর সাম্রাজ্য নামেও পরিচিত। আদতে এটা এমন এক সামাজিক বা সরকারী

কাঠামো যা জলের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচের প্রয়োজনের থেকে এই কাঠামো তৈরি হয়, যার জন্য কেন্দ্রীয় সমন্বয় এবং একটি বিশেষ ধরণের আমলাতন্ত্র প্রয়োজন। এটা একটি রাজনৈতিক কাঠামো যা সাধারণত শ্রেণি বা বর্ণের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিন্যাস এবং নিয়ন্ত্রণের একটি ব্যবস্থা তৈরি করে]। তাদের ধারণা ছিল জলের ওপর নির্ভর করে সমাজ ব্যাবস্থার উপরে এশিয়াতে লোকেরা যে কন্ট্রোল রাখত, তার উপরে ভিত্তি করেই পাওয়ার স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এটা একেবারেই সত্যি নয় -এখানে নেগোশিয়েশনের একটা ব্যাপার আছে - আমি অন্য দেশের ব্যাপারগুলো জানি না। কিন্তু এটার [এই ধারণার] মধ্যে আরেকটাও জিনিস আছে, যে[ধারণা]টা হচ্ছে সোসাইটি আনচেঞ্জিং থাকে, সেই ধারণাটা কোনদিন মার্ক্স অ্যাকসেপ্ট করেন নি - তাঁর লেখাপত্রে এটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং উনি এটাও অ্যাকসেপ্ট করেন নি যে, শুধু ইকনমিক বেসিসে এই জিনিসটাকে ধরা যায়। উনি [হাইনরিশ] হাইনের খুব ভক্ত ছিলেন, বালজাকের ভক্ত ছিলেন এবং জানতেন যে কালচারাল ফ্যাক্টারগুলো ইনভেরিয়েব্লি ইকনমিক ফ্যাক্টারগুলোর সাথে জড়িয়ে থাকে, সেগুলোরও একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনফ্লুয়েন্স আছে।

এবং আমি কোনদিন বিশ্বাস করি নি যে অত্যাচারিত মানুষরা অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রটেস্ট করবে না। ভারতবর্ষে আমাদের প্রচুর সময় রিভোল্ট হয়েছে এবং একটা বিখ্যাত রিভোল্ট ছিল দিব্যোক ও ভীমের রিভোল্ট [ইতিহাসে যার নাম দেওয়া হয়েছে কৈবর্ত বিদ্রোহ, যার কিছুটা বর্ণনা আমরা সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে পাচ্ছি] যার ফলে সেনেদের ক্ষমতায় চলে আসতে সুবিধে হল; এবং বহু ক্ষেত্রে রিভোল্টের চেহারা নিয়েছে ব্রাহ্মণীয় থাকবন্দীর বিরুদ্ধে, সেটা তো দেখা যায় সব থেকে আগে তামিল সঙ্গম সাহিত্যে, তারপরে আমাদের ভক্তি লিটারেচর ট্রাডিশনে। এবং এই কালচারাল জিনিসগুলো দিয়েই নিজেদেরকে মানুষ আলাদা করার চেষ্টা করেছে। তারা ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, নতুন ধরনের ধর্ম নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচার করেছে। শ্রীচৈতন্য যে বৈষ্ণবধর্ম এনেছিলেন, তার দুটো ভাগ হয়ে গেছিল। একটা হল ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণববাদ যেটা রূপ-সনাতনেরা [তৈরি] করেছিলেন। অন্য একটা বৈষ্ণববাদ ছিল, যেটা হরিদাসের সহযোগীরা [তৈরি] করেছিলেন। এবং তাঁরই উত্তরসূরী হিসেবে লালনের আবির্ভাব। সুতরাং, ঠিকই যে যারা মার্ক্সিজম-সোভিয়েত লাইনে বিশ্বাসী ছিলেন তার এভাবে বিকৃত করেছেন। কিন্তু, ইরফান হাবিবের মতন লোক, যাকে আমরা সব থেকে বড় মার্ক্সিস্ট হিস্টরিয়ান হিসেবে জনি, আজও ভারতবর্ষে বেঁচে আছেন, তিনি কোনদিন এভাবে জিনিসটাকে দেখেন নি। তিনি সুফিদেরকে নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি ভারতবর্ষের সমাজে

মহিলাদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তার যদিও নিজের রিসার্চ প্রধানত মুঘল সাম্রাজ্য এবং তার পরবর্তী সময়ের। কিন্তু এখন বেদিক পিরিয়ড নিয়েও আলোচনা করছেন, পোস্ট বেদিক পিরিয়ড নিয়েও আলোচনা করছেন। তার লেখা পড়লে আপনি এই ধরনের একটা মেকানিকাল পিরিওডাইজেশনের বিষয়টা পাবেন না।

অশেষ - নিশ্চয়ই পাব না, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলোচনার মধ্যেই লিঙ্কের যে টেকনিকাল সমস্যা হচ্ছিল তখন আপনার কাজগুলো নিয়ে কথা বলার সময় আলোচনা করছিলাম আপনি ইরফান হাবিবের 'এসেজ ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি টুয়ার্ডস এ মার্ক্সিস্ট পারসেপসান'-এর যে রিভিউ আর্টিকেলটা লিখেছিলেন 'রাইটিং ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ইন দা মার্ক্সিস্ট মোড ইন এ পোস্ট সোভিয়েত ওয়ার্ল্ড'- ওটা আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে একটা বড় এপিস্টেমোলজিকাল এন্ট্রি পয়েন্ট। '৯৬ তে যখন এটা লেখা হচ্ছে, সোভিয়েত ভেঙে গেছে, সেই সময় বামপন্থা, মার্ক্সবাদ এবং তার প্রতি আস্থা রেখে উৎপাদনকে দেখা, এইটা আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে মনে হয়েছে। আমি জাস্ট আপনাকে এটার রেসপেক্টে যেটা জিজ্ঞেস করব - ইরফান হাবিবও যখন কাজ করেছেন, এটা আমার স্পর্ধা নয়, আমি আপনাকে জিজ্ঞেশ করতে চাইছি, হয়ত আমার নির্বুদ্ধিতাও, সেটা হচ্ছে যে, এই যে মার্ক্সিয় ধারণায় রিকার্ডিয়ান রেন্ট থিওরি যে ভাবে ছিল এবং প্রাক-উপনিবেশ সময়ের যে জমি মালিকানার চিত্রটা, এর দুটোর মধ্যে যে গরমিল আছে, সেটা কি ইরফান হাবিবও খুব অ্যাড্রেস করেছেন? আপনার রিভিউ আর্টিকেলটায় আমার মনে হয়েছে যে আপনি ঐ কোশ্চেনটাকে যতটা অ্যাড্রেস করেছেন, ইরফান হাবিব অনেক বেশি কৃষি সংক্রান্ত বিরোধের মধ্যে ব্যাপারটাকে দেখার চেষ্টা করেছেন। আমার দেখাটা কি ভুল?

অমিয় - ইরফান কিন্তু বলেছেন খুব স্পষ্ট ভাবে যে ভারতবর্ষ একমাত্র দেশ যেখানে একটা ভাবগত ধারণা, একটা জাতিভেদ প্রথাকে ব্যাবহার করে দেশের এক-পঞ্চমাংশ লোককে চিরকালের জন্যে ভূমি ব্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত করেছে। এবং একটা এগ্রিকালচারাল প্রলেটারিয়েট, ক্যাপিটালিজম আসার অনেক আগে তৈরি হয়েছিল। ইরফান কিন্তু এটা খুব স্পষ্ট করে বার বার উল্লেখ করেছেন। এবং এই বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, একমতও। এই প্রসঙ্গে ইরফানের সঙ্গে আমার নিজের একটা বড় তফাত, সেটা হচ্ছে যে ইরফানের মতে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার ফলে ব্রিটিশ শাসন এসেছিল এবং সেই ভেঙে পড়ার কোনও ভাল এফেক্ট হয় নি। সেটা কিন্তু সত্যি নয়। কারন, এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে যখন মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙে যাচ্ছে, তখন বাংলার কিন্তু অনেক সমৃদ্ধি হয়েছিল। আগে যেরকম মুঘল দরবারে প্রচুর টাকা পাঠাতে

হত, সেটা পাঠাতে হচ্ছে না এবং এখানে নতুন যে সমস্ত কোর্ট উঠে আসছে, রুলিং মিডলক্লাস, ক্লাস হিসেবে আসছে। এখানে এটা বিষয় মনে রাখা দরকার - যেটা হিন্দুত্ববাদীরা ভুলে যায়, মুর্শিদকুলি খানের আমলে সব চেয়ে বেশি প্রসপারিটি পেয়েছিল কিন্তু হিন্দু জমিদারেরা। বিরাট বিরাট হিন্দু জমিদার তখন উঠেআসছিল - যেমন রাজসাহীর জমিদারি বিশাল আকার ধারণ করে, এবং এই রুলিং ক্লাসটা তখন আস্তে আস্তে তৈরি হচ্ছিল। এটা ঘটল শুধু বাংলাদেশে নয়, গুজরাটেও ঘটল, দক্ষিণে ঘটল। সেটা হল যে এই ডিসেন্ট্রালাইজেশনের সুবিধা নিয়ে ইওরোপিয়ানরা ঢুকে পড়ল। ইওরোপিয়ানদের যেটা সুবিধা ছিল, প্রথমত, ওদের অনেক বেশি ডায়রেকসান ছিল। ওরা জানত যে কি জন্য জন্য জয় করছে - ওরা টাকা পাওয়ার জন্যই জয় করছে। এবং তারা নিজদের মধ্যে যুদ্ধ করে অনেক বেশি মিলিটারি টেকনোলজিকে ইমপ্রুভ করেছিল। এমনিতে ওদের ওখানে সিক্সটিন সেঞ্চুরি থেকে যে ক্যাপিটালিজম শুরু হল, তার ফলে বেশ কিছু ইনোভেশান হয়েছিল - এটা কিন্তু মার্ক্স বার বার বলেছেন এবং এই ইনোভেশানের ফলে এদের নেভি পাওয়ার বাড়ল, ওদের মিলিটারি অরগানাইজেশান বাড়ল, ওদের উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ যে অনায়াসে আইরিশদেরকে ঠাণ্ডা করতে পারলেন বা তার আগে গুস্তাভাস [এডোলফাস] যে ক্যাথলিক পাওয়ারগুলোকে ঠাণ্ডা করতে পারলেন, তার প্রধান কারন হল যে তাদের মিলিটারি অরগানাইজেশনের সেন্সটা অনেকটাই নতুন এক খাতে বইছিল। আমাদের এখানে সেই সেন্সটা অতটা ডেভেলাপড হয় নি। এই যে আমাদের এখানে রাজপুতদের শৌর্যের প্রচুর প্রশংসা করা হয়, কিন্তু আপনি ভালো করে ক্রস-চেক করে দেখবেন যে রাজপুতরা যুদ্ধে হেরে আর রিওরগানাইজ করার চেষ্টা করে না - হয় সাবমিট করেছে, নয় পালিয়ে গেছে। ইওরোপিয়ানদের ক্ষেত্রে বার বার দেখা যায় যে ওরা হেরে যাওয়ার পরেও আবার রিওরগানাইজ করে পালটা আক্রমণ চালিয়েছে। যেমন পিটার দি গ্রেট, তার আগে সুইডেনের পাওয়ার প্রচণ্ড বেড়ে গেছিল। এবং চার্লস দি ফোর্থ, পিটার দি গ্রেটের সাম্রাজ্য রাশিয়াকে অ্যাটাক করেছিল। তাকে লুঠ করার পরে আর সুইডেনের ক্ষমতা থাকে নি সাম্রাজ্য বিস্তারের। আমাদের দেশের মিলিটারি টেকনোলজি এবং ওয়েপনরিটা ডেভেলাপ না হওয়ার ফলে ইওরোপিয়ানরা এত সুবিধা করতে পেরেছিল। এই নিয়ে অনেকখানি আলচনা করেছেন যদুনাথ সরকার, যেটা নিয়ে তারপরে আমি এ দেশে আর আলোচনা দেখি নি, বিদেশে মিড ইত্যাদি অনেক আলোচনা করেছেন [অন্য দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আলোচনা শেষে ৩ নং উল্লেখ দেখুন]।

অশেষ - আমি জানি না এটা আপনার সামনে বলা কতটা বাচালতা হবে। কিন্তু আমি যেটা জানতে চাইছি যে এই যে আপনি গোটাটা বললেন, সেই সময়ের ব্রিটিশ

ভারত, সেই সময়ের ভারত বলতে যে ভৌগোলিক অঞ্চলটা বোঝাত, তার থকে বাংলাকে খানিকটা আলাদা করে আমরা দেখব না? এই কারণে জিজ্ঞেস করছি, ধরুন আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাকি ভারতবর্ষে যখন মিতাক্ষরা উত্তরাধিকার নীতি প্রচলিত, তখন বাংলায় বা আসামে দায়ভাগ উত্তরাধিকার হচ্ছে। এবং এটার একটা বড় কারন সম্ভবত মহিলাদের প্রোডাকশানে অন্তত প্রতক্ষ যোগদান এবং গুরুত্ব। মানে, এটা কেউ মহিলাদের দয়া করে দেয় নি। এটা এখানকার মহিলাদের সেই সময়ের অর্জন। আবার এই অর্জনটা হতে পারে এমন একটা ব্রাহ্মণ্য বন্দোবস্ত যেটা এই নেগোসিয়েশানে ঢুকতে পারে সেটার মধ্যেই অবশ্যই মাথাভারি ব্রাহ্মণত্ব ততটা থাকার কথা নয় যেটা উত্তর বা দক্ষিণ ভারতে হয়ত অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। এ ক্ষেত্রে কি বাংলাকে আলাদা করে দেখাটা সমীচীন? এটা এক নম্বর। দু'নম্বর অবজারভেসান যেটা, সেটা হচ্ছে ধরুন এই যে আপনি বিভিন্ন লিটারারি রেফারেন্স দিচ্ছেন - আমি যদি শুধু তারাশঙ্করের [বন্দ্যোপাধ্যায়ের] 'গণদেবতা'-ই রেফার করি, গণদেবতায় গোটা অশান্তিটা তৈরি হচ্ছে ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে জরীপের চেন যাচ্ছে, ধান নষ্ট হবে বলে। জরীপের এই যে ধারণা, এটা সেই সময়ের বাংলায়, সেই সময়ের গ্রামীন কৃষকের কাছে নতুন - যে গ্রাম অনেক বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ - যেখান থেকে একটা অনি কামার চলে গেলে গ্রামে শোরগোল পড়ে যায়, কারন গ্রামে প্রোডাকশান ম্যাটেরিয়ালগুলো তৈরি হয়। এই যে ভিলেজ সোসাইটির স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারটা কি খুব ব্রাহ্মণ নিয়ন্ত্রিত? নাকি নিচু জাতের মানুষরা, মানে, আমি যদি সেই সময়ের জাতবর্ণ বলি, তাদের একটা স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে অনেক বেশি দেখায় যেখানে, নিচু জাতের মানুষ, মহিলা, এদের উৎপাদনে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন আছে? এই দেখা টা কি খুব ভুল হবে?

অমিয় - [প্রায় দুমিনিট খুব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। তারপরে] দেখুন আমি এই সমস্ত সোশ্যাল স্ট্রাকচারের কথা জানি না, কিন্তু মজার কথা হচ্ছে যে বাংলায় মহিলারা যতটা, বিশেষ করে, ধরুন মাইসোর বা দক্ষিণের অন্য অঞ্চলের মহিলারা, কিন্তু অনেক বেশি চাষের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের মহিলাদের মাঠে অনেক বেশি মহিলাদের প্রেজেন্স দেখা যায়। এবং এখন যদি দেখেন, দেখবেন যে মহিলাদের পার্টিসিপেশান ইন জেনারাল ওয়ার্ক বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং এটা দিয়ে জিনিসটা বুঝতে পারবেন না। [এর পরের অংশটাও খুব পরিষ্কার না]

অশেষ - বিশ্বেন্দুদা তোমার কি কোনও প্রশ্ন আছে?

বিশ্বেন্দু - না প্রশ্ন না। তবে, অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশক থেকে হ্যালহেড, কোলব্রুক ইত্যাদিরা এসে যখন মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, মানে, যখন আমরা একটা ব্যবস্থা থেকে আরেকটা ব্যবস্থায় অভিবাসিত হচ্ছি

১৭৬৫-র পরের সময়, তখন তুমি যে জায়গাটা ধরার চেষ্টা করলে, সেটা হচ্ছে যে মহিলাদের যতটুকু সম্পত্তির, অধিকার ছিল - এমন নয় যে খুব বড় সম্পত্তির অধিকার তাঁদের ছিল - সেটাই ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বন্ধু দেবোত্তম চক্রবর্তী একটা বই করেছেন বিদ্যাসাগরকে নিয়ে, নতুন ভাবে নবজাগরণের সময় দেখার চেষ্টায়, সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন যে মেয়েদের যতটুকু সম্পত্তির অধিকার ছিল, ততটুকু অধিকারও কেড়ে নেওয়া হল আইন করে। অমিয়বাবু যে ভাবে ধরেছেন যে কারিগররা আস্তে আস্তে শ্রমিক হচ্ছে, কারিগরদের টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিভিন্ন প্লান্টেশানের কাজে, বাংলায়, বাংলার বাইরে, ভারতবর্ষের বাইরে এবং তার সাথে সাথে মহিলাদেরও ক্ষমতা হরণ হচ্ছে। গোটা অষ্টাদশ শতকে মহিলা জমিদার যেমন রাণী ভবানী ছিলেন। এরকম কুড়িজনের বেশি মহিলা জমিদারের নাম পাচ্ছি। সে সময়ে মহিলাদের যতটুকু ক্ষমতা ছিল, আস্তে আস্তে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী, জোন্স, হেস্টিংস, কোলব্রুক, এদের উদ্যমে আইন এনে মহিলাদের নানান ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হল। এবং তার সঙ্গে কারিগরদের, যে কারিগরদের জন্য বাংলায় বিপুল সংখ্যক লোক, প্রায় তিরিশটা দেশের বণিক বাংলায় জিনিসপত্র কিনতে আসছিলেন অষ্টাদশ শতকের শুরুতে। যেখানে শুধু ফিনিসড প্রোডাক্ট নয়, ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্টও থাকত, সেই কারিগরি উৎপাদন ব্যাবস্থা যেখানে কারিগরের হাতে তার প্রযুক্তি ছিল, উৎপাদনের উপকরণ ছিল, উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণ ছিল, কিছুটা বাজারেরও নিয়ন্ত্রণ ছিল এবং তার উদ্বৃত্তগুলো সে বিদেশে পাঠাতে পারত - এই যে উৎপাদন ব্যবস্থা, সেখানে মহিলাদের একটা বড় ভূমিকা ছিল। এবং বাংলায় চরকা কাটনিরা বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করছেন, থাকবন্দী নির্বিশেষে পরিবারের মেয়েরা চরকায় সুতো কাটছেন। ১৮২৮ সালের সমাচার চন্দ্রিকায় এক মহিলা চরকা কাটনির দুঃখের চিঠি প্রকাশ পাচ্ছে - সেখানে তিনি বলছেন, সুতো কাটার অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও চরকা চালিয়ে শ্বশুরের শ্রাদ্ধ, তিন মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন এমনভাবে যাতে কেউ না ভাবে যে রাঁড়ের [অর্থাৎ বিধবার] মেয়ের নম নম করে বিয়ে হচ্ছে। ১৮২৮ মানে ১৭৯৩-তে জনগণের জন্য সম্পত্তি, জমির এনআরসি হয়ে গেছে, বাংলার ১৭৭০-এ ১ কোটি মানুষ মারা গেছে, মন্বন্তর নামে একের বেশি গণহত্যা হয়েছে, বাংলার কৃষক, কারিগরদের হাত থেকে সম্পদ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, তার শিল্প কাঠামো ধ্বংস করা হচ্ছে, তার ওপর অত্যাচার নামিয়ে আনা হচ্ছে, মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার, উৎপাদন ব্যবস্থায় জুড়ে থাকার অধিকার, জমিদার হিসেবে পাবলিক ডোমেইনে সক্রিয় থাকার অধিকার, কাছারিতে রাজস্ব জমা দেওয়ার অধিকার [জেরেটের 'আইনইআকবরি' অনুবাদসূত্রে] কেড়ে অন্তঃপুরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমদের মনে হয় অধিকার হরণ উপনিবেশকে বোঝার, এই যে ট্রানজিশনের পিরিয়ডকে বোঝার গুরুত্বপূর্ণ তরিকা - আপনার মন্তব্য জানতে

আগ্রহী।

অমিয় - ব্যাপার হচ্ছে ইংল্যান্ডেও মহিলাদের কোনও অধিকার ছিল না। যখন কোনও মহিলা কাউকে বিয়ে করতেন, তখন স্বামীর সম্মতি পেলেই সম্পত্তির অধিকার পেতেন। ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল-এর রেকর্ড থেকে পাই, ইওরোপিয়ান মহিলা ধার করলে, তার স্বামীকে ওয়ারেন্টার হতে হত। তিনি নিজে থেকে ধার করতে পারতেন না। এবং এই ব্যাবস্থা তারা আমাদের দেশেও চালু করেছিল। সুতরাং মহিলাদের অবস্থা আগের থেকে অনেক খারাপ হয়েছিল। কিন্তু মহিলাদের অবস্থা সব থেকে বেশি খারাপ হয়েছিল যখন স্পিনিংটা সম্পূর্ণ চলে গেল। কুটিরশিল্পে যারা কাজ করত, তাদের বেশির ভাগ অংশই ছিল কিন্তু স্পিনার- যারা চরকা দিয়ে কাজ করত। চাষীদের প্রফেশানে [মহিলা] অনেক কম ছিল। কজেই সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছিল ওইটাতে।

আরেকটা কথা বলা দরকার, যে দায়ভাগ আইনে কিন্তু বাঙ্গালিদের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কারন হল, আপনি যদি নাইন্টিন সেঞ্চুরির বণিকদের ইতিহাস দেখেন, দেখবেন যে দায়ভাগ আইনে যেটা হয়, যে কর্তা সমস্ত সম্পত্তির মালিক। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন। যতদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঁচে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পুর্ণভাবে তার উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিলেন। রেণুকাকে এগার-বারো বছর বয়েসে বিয়ে দিতে হয়েছিল, তার কারন হল তখনও দেবেন্দ্রনাথ বেঁচে বিয়ের জন্য টাকা দেবেন এটা ভেবে। এবং যখন কোনও কর্তা মারা যেতেন, সেই কর্তার নামে সমস্ত সম্পত্তি রেকর্ডেড থাকল। মিতাক্ষরা আইনে যেটা হয়, সেটা হল যে আনবর্ন চাইল্ড ইস আলসো এ উত্তরাধিকার। যখন ব্যাঙ্ক অফ বম্বে ফেল করল ১৮৮১ সালে, তখন কিন্ত ওখানকার বনিয়াদের এত বেশি ক্ষতি হয়নি, কারন একটা আইন তার আগেই পাস করেছে বম্বে অ্যাসেম্বলি তো এক্সেম্পট সন অফ দি (বোঝা যাচ্ছে না)। তার থেকে বড় কারন ছিল তারা বলতে পারত আমার সম্পত্তি নয়, আমার ছেলের সম্পত্তি, আমার নাতির সম্পত্তি। সেটা কিন্তু বাংলাদেশে সম্ভব হত না। এখানে একের পর এক যখন এজেন্সি হাউসগুলো ফেল করল- অ্যালেকজান্ডার অ্যান্ড কোম্পানির মত বহু উদ্যম, তখন যে ওদের পার্টনার ছিল, তাদের সমস্ত সম্পত্তি ওরা ক্রোক করে নিত। তার কারনে রাধাকান্ত'র মত লোক দেউলে হয়ে গেছিলেন। এবং বাঙালি বানিয়া বলতে, ১৮৬০ এর দশকের রামগপাল ঘোষ ছাড়া আর কেউ রইলেন না।

অশেষ - স্যার আমি এখানে পরের প্রসঙ্গটায় আসি। যেটা আপনার আরেকটা বড় কাজ স্টেট ব্যাঙ্কের ইতিহাস। আপনি পুঁজির গঠনটাকে যেভাবে সেটা একটু সকলের বুঝার মতন করে বলবেন?

অমিয় - প্রথম কথা হচ্ছে যে পৃথিবীর সব থেকে পুরনো ব্যাঙ্ক এখনো বেঁচে আছে। সিইয়েনাতে, ফিফটিন্থ্ সেঞ্চুরির ব্যাঙ্ক। ইট্যালিয়ানরা এই ব্যাঙ্কটাকে স্থাপন করেছিল। সেখান থেকে সে বিভিন্ন দেশে পৌঁছেছিল। আমাদের দেশের ব্যাঙ্কিং ছিল। বিরাট বিরাট ব্যাঙ্কারের কথা পাচ্ছি। শুধু জগত শেঠের কথা আমরা জানি। কিন্তু জাতকের প্রচুর বড় বড় ব্যাঙ্কারের কথা উল্লেখ আছে। একজন শ্রেষ্ঠী জেতবন সোনা দিয়ে মুড়েদিয়েছিলেন গৌতম বুদ্ধের জন্য। এগুলো ছিল, কিন্তু যেটা ছিলনা সেটা হচ্ছে জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কিং। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ডিপজিট নেওয়া হত, কিন্তু সেটা ইনফর্মাল ব্যাপার ছিল। যেটা ইওরোপিয়ানরা নিয়ে এল সেটা হল জয়েন্ট স্টক ব্যাঙ্কিং। এবং জয়েন্ট স্টেট ব্যাঙ্কিং প্রথম দিকে যেগুলো হয়েছিল আমাদের দেশে, যেমন ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্তান বা ইউনিয়ান ব্যাঙ্কও, এগুলো কিন্তু লিমিটেড লায়াবিলিটি ছিল না, কারন তখনও কিন্তু ব্রিটিশরা আমাদের দেশে লিমিটেড লায়াবিলিটি ব্যাঙ্ক তৈরি করে নি। প্রথম লিমিটেড লায়াবিলিটি আইন হল ১৮৬০-এর দশকে। কিন্তু, স্টেট ব্যাঙ্কের যারা পূর্বসূরী ছিল - প্রথম ব্যাঙ্ক হল ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা, তার পর হল ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল, তার পর ব্যাঙ্ক অফ বম্বে এবং তার পরে ব্যাঙ্ক অফ ম্যাড্রাস। এগুলোকে লিমিটেড লায়াবিলিটির সুরক্ষা দেওয়া হয়েছিল পারলামেন্টারি চার্টার দিয়ে। এবং একটা কথা অনেক জায়গায় বলা হয়েছে আগে, যে ভারতীয়দের তো অনেক টাকা ছিল, ওরা কেন রেলওয়েতে ইনভেস্ট করে নি? রেলওয়েতে ইনভেস্ট করবে কি করে? কারন রেলওয়েতে ইনভেস্ট করতে গেলে নিজদের একটা চার্টার কোম্পানি খুলতে হবে, তা না হলে ব্রিটিশদের কোম্পানিতে ইনভেস্ট করলে কোম্পানিতে তাদের নিজেদের কোনও কন্ট্রোল থাকবে না। তারা জানবেই না যে কি ভাবে তার টাকা ব্যাবহার করা হচ্ছে। সুতরাং নানা ভাবে ব্রিটিশরা আমাদের দেশে যারা সম্পত্তিবান লোক, তাদেরকেও প্রফিটেবল জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। একটা কথা এখানে বলি, আমি দেখিয়েছি আমার অন্য লেখাতে, স্টেট ব্যাঙ্কের ইতিহাসে লেখা আছে কি না জানি না, বম্বেতে যে এতদিন অনেক ব্যাবসায়ী সারভাইভ করছিল, পার্সি শুধু নয়, হিন্দু গুজরাটি, গুজরাটি বোহরা - তার একটা বড় কারন হল যে বম্বে বাংলার চেয়ে অনেক পরে ব্রিটিশদের অধিকারে এসেছিল এবং ততদিনে ওদের [স্থানীয় ব্যবসায়ীদের] যে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল, সেটা ধ্বংস হয়নি। এই জন্যেই আপনি দেখতে পাবেন যে গুজরাটে এবং বম্বেতে প্রথম তুলা শিল্পে ভারতীয় বণিকরা ইনভেস্ট করতে আরম্ভ করল। এবং সেই তুলা শিল্প একটা সময় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যে তার সঙ্গে ব্রিটিশরা কম্পিট করে উঠতে পারছিল না। সে জন্যে নানাভাবে সেটাকে তারা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল - প্রোহিবিটারি মেজার প্রয়োগ করে - তাদের ওপরে নানান শুল্ক চাপিয়ে দিয়ে। পশ্চিমবাংলায় আপনি দেখতে পাবেন একটা মাত্র পরিবার সীতানাথ

রায় টিকতে পেরেছিল, যাদের ব্যবসার বর্তমান রূপ হল পিয়ারলেস গ্রুপ।

অশেষ - আমার দিক থেকে শেষ প্রশ্নটা বলে দিই। আপানি শুরুর কথাটা বলতে গিয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পরবর্তী জমিদারদের সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের তুলনা করেছেন। সেই কারনেই আমি এইটা বুঝতে চাইব আজকের সময় দাঁড়িয়ে এই আলোচনাটা, বিশেষ করে এই প্রতিরোধের রাজনীতি কতটা প্রাসঙ্গিক? এটা আমার শেষ প্রশ্ন থাকবে। কিন্তু তার আগে দু'জন দর্শক-শ্রোতা প্রশ্ন করেছেন। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি বলেছেন ধনতন্ত্র উপনিবেশের উত্থান ইওরোপে ১৬ শতাব্দী থেকে হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে ইওরোপের সম্পর্ক বহু দিনের। ভারতীয় শাসক ও সমাজনেতৃত্ব কি এই ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না? তারা কিভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন? বা প্রতিরোধ কী করলেন আদৌ? আরেকটা প্রশ্ন যেটা এসেছে যে মহিলাদের এই ক্ষমতা হরনের যে প্রসঙ্গটা আগের উত্তরে এল, সেইটার সঙ্গে কি কোথাও সতীদাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ, মহিলা শিক্ষা, এই যে তিনটে বিষয়কে পরে জোড়া হয়, সেটা বাংলায় আগের ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিল নাকি উপনিবেশের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া তিনটে সমস্যা উপনিবেশের পরে তার সমধান তৈরি হল? আপনি কি ভাবে দেখবেন?

অমিয় - প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, ভারতীয় শাসকরা সত্যি অবহিত ছিলেন না। আলবিরুনির যে বই তাহকিক-ই-হিন্দ, তাতে উনি বলেছিলেন যে ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের সাথেই প্রধানত ইন্টারাক্ট করতেন। তারা অনেক কিছু জানেন, তাদের সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ওদের ধারণা ছিল ওরা ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না, কাজেই কারোর কাছ থেকেই শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি তারা। এই ধারণাটা কিন্তু ভারতীয় শাসকদের মধ্যে চিরকাল ছিল। আপনি তার একটা খুব ভালো ড্রামাটিক এক্সপ্রেসান পাবেন। নানা ফড়নবিসের ওপরে বিজয় তেণ্ডুলকরের ঘাশিরাম কোতয়াল নাটকে। ইনি সাপোসেডলি দারুণ ভালো রাজনৈতিক ছিলেন, পেশোয়াদের ভাল পরামর্শ দিতেন, কিন্তু কোনও ধারণা ছিল না যে ব্রিটিশরা/ইওরোপিয়ানরা কি ধরনের মেনিস। এই ব্যাপারটা বরাবর ছিল। যে লোকটি এই ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝেছিলেন এবং ব্রিটিশরা তার সঙ্গে সেই লড়াইটা লড়েছিল এবং খুব কষ্ট করে লড়াইটা করতে হয়েছিল - তিনি হলেন টিপু সুলতান। তিনি বুঝেছিলেন যে এগুলোর কি দরকার এবং অনেক মিলিটারি টেকনোলজি ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করেছেন। এখন যেটাকে বলে হয় [???] রকেট, সেটা কিন্তু টিপু সুলতানের জেনারেলরাই বানিয়েছিল, এবং টিপু সুলতানকে হারিয়ে দেওয়ার পরে ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলি এত খুশি হয়েছিলেন যে তিনি [???] তৈরি করেন। অন্যদের ব্যাপারে যতদুর আমি জানি, তাদের কোনও সেন্স ছিল না যে কি ভাবে এদেরকে প্রতিরোধ করা

যায়। বড়জোর রণজিৎ সিংহ যেটা করেছিলেন, যেটা খানিকটা সিরাজ-উদ-দৌলাও যেটা করেছিলেন, কিছু বিদেশী সেনপতিদের দিয়ে তাদের সৈন্যকে ট্রেনড করিয়েছিল। কিন্তু তার বেশি তারা কিছু করে নি। এটা হল প্রথম প্রশ্নটার জবাব।

দ্বিতীয় প্রশ্নটার পুরো উত্তরটা তো জানিনা, কিন্তু আকবর সতীদাহ বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। বলেছেন যে কাজীরা দেখবেন যে সতীদাহতে তারা সত্যিকারের ইচ্ছায় চিতায় আরোহণ করছেন না করেন নি। বাংলায় যে এত বেশি সতী তার একটা প্রধান কারন হল, আমার ধারণা যে ব্রাহ্মণদের আগের যে প্যাট্রোনেজ ছিল, জমিদারদের থেকে পাওয়া, বা নবাবদের কাছ থেকে পাওয়া, এই প্যাট্রোনেজগুলো চলে গেল তারা তখন মেয়েদেরকে তো মেন্টেন করতে পারত না, কাজেই তারা মারা গেলে, তাদের আত্মীয়-স্বজন তাদের পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত। সুতরাং বহুবিবাহের সঙ্গে সতীদাহটা জড়িয়ে আছে। এবং আপনি দেখবেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সতীদাহটা হয়েছে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে। পূর্ব বাংলায় অতটা হত না, যতদূর আমার জানা আছে। কিন্তু অন্য দিকে মহিলাদের যে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল - এই শিক্ষা দেওয়ার ভাবনাটা নিশ্চয়ই আমি মনে করি উপনিবেশিকতার সঙ্গেই এসেছে। রবীন্দ্রনাথের ফরমুলেশানের সাথে আমি একমত, যে পশ্চিম আমাদের অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কিছু কিছু জিনিস দিয়েওছে। মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারটা কিন্তু ওদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি। ব্রিটিশপূর্ব সময়ে মেয়েরা পড়ত বলে জানি না। অবস্থাপন্ন পরিবারের মহিলাদের পড়ানোর জন্য বৈষ্ণবীরা আসতেন, কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা অশিক্ষিত ছিলেন। প্রথম শিক্ষার আলো এল ব্রাহ্ম ধর্মের হাত ধরে। দেবেন্দ্রনাথ সেটা কিন্তু মুসলিম ধর্ম থেকে পেয়েছিলেন, সুফিদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তার পরে বিদ্যাসাগর এটাকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তিনি নিজের পয়সা খরচ করে মেয়েদের অনেক স্কুল করেছিলেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে, ইওরোপিয়ানদের কাছে আমাদের একটা ঋণ আছে। এটা আমাদের না মানলে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা হবে [অন্য তথ্যের জন্য আলোচনার শেষে ১ নং প্রবন্ধ দেখুন]।

বিশ্বেন্দু - আমরা যেহেতু কারিগর সংগঠন করা মানুষ, মনে করি শিক্ষার তো দুটো আঙ্গিক আছে, একটা প্রাতিষ্ঠানিক আরেকটা অপ্রাতিষ্ঠানিক। বিশেষ করে যারা চাষি, কারিগর, হকারদের একটা নিজস্ব জ্ঞানচর্চা আছে, যেটা প্রাতিষ্ঠানিক না, অপ্রাতিষ্ঠানিক। স্মৃতি নির্ভর জ্ঞানচর্চা। এবং বংশ পরম্পরায়, গোষ্ঠী পরম্পরায়, গুরু পরম্পরায়, এই চর্চা হয়ে এসছে। এবং সেখানে মেয়েদের একটা বড় ভুমিকা আছে। এই চর্চায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে হয়ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না

যে মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছেন, কিন্তু তারা উৎপাদন ব্যাবস্থার অংশ হিসেবে, প্রযুক্তিধারক হিসেবে, উৎপাদন ব্যবস্থায় একটা বড় ভুমিকা পালন করার জন্য কিন্তু জ্ঞানী এবং শিক্ষিত - অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থে। কুমোরের চাকের মতন দুটো তিনটে উৎপাদনে মেয়েরা অংশ নিতে পারতেন না। কয়েকটা জায়গায় স্পষ্ট বারন ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা বাদ দিলে বিপুল সংখ্যক কারিগরি ব্যাবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে মেয়েদের অবিসংবাদী ভুমিকা ছিল। এই দীর্ঘ জ্ঞানচর্চার ইতিহাস, দীর্ঘ প্রযুক্তিচর্চার ইতিহাস প্রায় অচর্চিত। যে জন্য আমরা মনে করছি যে সম্পত্তির একটা অংশের উত্তরাধিকার বাধ্য হয়েছে সমাজ তাকে দিতে, কম হলেও হলেও তাকে অবহেলা করার গুস্তাখি করে নি। বিবাহিত মহিলার যে অর্জন শ্বশুরবাড়িতে এসে, যে উপহারগুলো তিনি পাচ্ছেন - স্ত্রীধন, সেই উপহারের মালিকানা কিন্তু পুরুষের বা তার পার্টনারের নয়। এই অর্জনগুলো আমাদের মনে হয়েছে ব্রিটিশপুর্ব সময়ের আর্থিক কাঠামোয় মহিলাদের অংশগ্রহণের সুবাদে। যে জন্য বাংলা এবং পূর্বভারতের একটা বিপুল অংশে মেয়েদের একটা বড় ভুমিকা ছিল। যে জন্য নাথ গুরু মীননাথ আসামে কদলি রাজ্যে ভেড়া হয়ে থাকার এক্সপ্রেশন পাচ্ছি। আমাদের মনে হয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জন দুটোর মধ্যে তুল্যমূল্য করা দরকার। অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে মহিলা ৫০০-৬০০ কাউন্টের সুতো তৈরি করছেন, এই যে রোজগারের জায়গাটাকে কেড়ে নিচ্ছে উপনিবেশ এবং তাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। ১৮০৮-এ পাটনায় তিন লক্ষ চরকা কাটনি হিশেব পাওয়া যাচ্ছে, আপনি যখন দেখাচ্ছেন বিশিল্পায়ন পূর্ণোদ্যমে চলছে তখন। এই জায়গাটা মহিলাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ফলে জ্ঞানচর্চা, শিক্ষাচর্চা, এটা আমরা আমাদের মতন ভাবে, অপ্রাতিষ্ঠানিক ভাবে দেখি। এটা হচ্ছে আমাদের বক্তব্য, রাখলাম আপনার কাছে। পরিষ্কার করতে পারলাম?

অমিয় - হ্যাঁ পরিষ্কার হয়েছে। মেয়েদের কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, এটা আমি সম্পূর্ণ এক মত [অনেকটা বোঝা যাচ্ছে না]। এবং আরেকটা ব্যাপারে আমার স্কেপ্টিসিজম আছে। মেয়েদের কতটা অ্যাকচুয়াল সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হত। আমি একটা আসল অ্যানেকডোট বলছি। হেমাঙ্গ দাস নন্দী, শেষের দিকে বেশ ভালো রকম পরিচয় হয়েছিল। উনি বলেছিলেন যে ওনার বাবা জমিদার ছিলেন, কিন্তু তার মা চাল থেকে কাঁকর বেছে, বিক্রি করে ঘর চালাতেন। তিনি গরিব ঘরের ছিলেন, বাড়িতে সাহায্য করতেন। আদারওাইস, তার আর কোনও অধিকার ছিল না।

তার পরে ধরুন, হিন্দু কোড বিল হল, তার পরে মহিলাদের যে অধিকার দেওয়া হল, কতজন মহিলা সেটা পেয়েছেন? আপনি যদি ভারতে এখন দেখেন, তাহলে দেখবেন ডাউরি ডেথের একটা বড় কারন হচ্ছে যে মেয়েদেরকে বলা হল

যে বাপের বাড়ি থেকে তুমি যথেষ্ট টাকা পাও নি, তাই তোমাকে খুন করছি। সুতরাং এই ব্যাপারে আমার স্কেপ্টিসিজম আছে। এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারে একটা কথা বলি, যে বালুচরি শাড়ি ছিল আমাদের, সেটা সম্পূর্ণ ভাবে উঠে গেছিল। এগুলো আগে বেঁধে বেঁধে তৈরি করা হত, এবং পরে সেটার পুনরুদ্ধার করলেন অক্ষয় দাস বলে একজন কারিগর। বাঁকুড়াতে আবার তাঁতিরা করতে আরম্ভ করলেন। সুতরাং আমি যেটা মনে করি যে গোটা জিনিসটার একটা প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়া দরকার। এটা একটা ইমপ্লিসিট নলেজের মধ্যে থাকলে চলবে না। এবং এটার চেষ্টা করেছিলেন মনীন্দ্র নন্দী, তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। বাংলাদেশে এতগুলো স্কুল বা কলেজ আর কেউ প্রতিষ্ঠা করে নি। উনি একটা টেকনিক্যাল স্কুলে এই ধরনের জিনিস পড়ানর চেস্টা করেছিলেন। যাতে করে সত্যিকারের অ্যাপ্রেন্টিসশিপ দিয়ে লোকদেরকে শিক্ষিত করা যায়। নতুন টেকনোলজি দিয়ে শিক্ষিত করা যায়। আমি মনে করি যে প্রাতিষ্ঠানিক ফর্ম করা তা ভীষণ জরুরি [ওনাকে আর বলা হয় নি, উনি কিন্তু উপনিবেশের আগের উদাহরণ দিচ্ছেন না বরং অধিকার কেড়ে নেওয়ার পরের সময়ের উদাহরণ দিচ্ছেন। আর অপ্রাতিষ্ঠানিককে প্রাতিষ্ঠানিকতায় ঢেলে সাজানো নিয়ে আমাদের অন্য বক্তব্য আছে। ইওরোপিয় নবজাগরণের প্রযুক্তি আদতে কারিগরিকে আত্মস্থ আর সমান্তরালভাবে ধ্বংস করার উদ্যম ছিল]।

অশেষ - মানে আপনার মতে এই জন্যেই প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রয়োজন ছিল। এটা শুধু ইমপ্লিসিট থাকলে, এটা ক্যারিডওভার হত না হয়ত। এইটা আপনার অবস্থান।

আমি এইবার শেষ প্রশ্নে আসি। সেটা হচ্ছে যে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই উপনিবেশ বিরোধী চর্চা, উপনিবেশ, প্রাক-উপনিবেশ সময়টাকে ফিরে দেখা, বিশেষকরে বামপন্থী রাজনীতির পরিসরে, যেখান থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনটা তৈরি হবে - এই প্রত্যাশাটা অনেকে রাখেন, সেইটাকে আপনি কি ভাবে দেখবেন এবং বলবেন? মানে আজকে এই চর্চাটা কি অবস্থায় আছে আর কি কি হওয়া দরকার? কোন কোন কাজ এখনও বাকি আছে?

অমিয় - আমি নিজে মনে করি সোভিয়েত ইনফ্লুয়েন্সটা এখনও পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। সব থেকে খারাপ উদাহরণ ছিল [বোঝা যাচ্ছে না]। তাদের অনেক বেশি বোঝা দরকার যে জাতপাতের ব্যাপারটার কতটা গভীরে আমরা আছি। এবং আদিবাসীরা এখন কতটা আমাদের থেকে দূরে সরে আছে। বামপন্থী অনেকে তো শান্তিনিকেতনে থেকেছেন। কতজন সাঁওতালি ভাষাটা শিখেছেন? আমিই বা কতটুকু শিখেছি? শুধু কয়েকটা কথা জানি, কিন্তু ভাষাটা তো শিখিনি। বামপন্থী আন্দোলন যারা করবেন, তাদের এদের মধ্যে মিশে যেতে হবে। মাইনরিটি কমিউনিটিতে বেশি করে মিশে যেতে হবে। তবেই তাদের বিশ্বাস তারা অর্জন করতে পারবেন, এবং ভবিষ্যতে একটা বামপন্থী

সরকার গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন।

অতিরিক্ত সংযোজন

১

অমিয়কুমার বাগচীর দুটো মন্তব্যে দেবোত্তম চক্রবর্তীর নোট অব ডিসেন্ট

"তার থেকে বড় কারন ছিল তারা বলতে পারত আমার সম্পত্তি নয়, আমার ছেলের সম্পত্তি , আমার নাতির সম্পত্তি। সেটা কিন্তু বাংলাদেশে সম্ভব হত না।" [এটা ঠিক নয়। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার বাংলায় একাদশ আইন (Regulation XI)-এর ষষ্ঠ ধারা অনুসারে, কোনও হিন্দু ব্যক্তিকে ১৭৯৪-এর ১ জুলাইয়ের আগে বা পরে কেনা তার যাবতীয় জমিজমা বা সম্পত্তি, তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা তার পরবর্তী উত্তরাধিকারী কিংবা তার অন্য পুত্র বা উত্তরাধিকারী অথবা অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে দেওয়ার অধিকার দেয়। এই আইন অনুযায়ী রামমোহন রায়ের বাবা রামকান্ত রায় তাঁর জীবদ্দশায় ১৭৯৬ সালের ১ ডিসেম্বর, তাঁর স্বোপার্জিত সম্পত্তির সামান্য অংশ নিজের জন্য রেখে বাকি সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করে দেন।]

"সুতরাং বহুবিবাহের সঙ্গে সতীদাহটা জড়িয়ে আছে। এবং আপনি দেখবেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু এই সতীদাহটা হয়েছে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে।" (পৃ. ২৯) - সতীদাহের সরকারি পরিসংখ্যান এই দুটি তথ্যকে সমর্থন করে না। প্রথমত, সরকারি সমীক্ষাতেই জানা যায়, বাংলার মোট সতীর মধ্যে ৯৮% বিধবা একাই চিতায় আরোহণ করেন এবং মাত্র ১.৬% ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির সঙ্গে একাধিক বিধবা একসঙ্গে সতী হন। এঁদের মধ্যে ৫২টি ক্ষেত্রে ২ জন বিধবা, ৪টি ক্ষেত্রে ৩ জন ও ৩টি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৪ জন বিধবা স্বামীর সঙ্গে সতী হন। সরকারি পরিসংখ্যানেও একজন পুরুষের সঙ্গে ৪ জনের বেশি বিধবা নারীর সতী হওয়ার একটি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়নি। সে হিসাবে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকার কারণে ১৮১৫-১৮২৮ পর্যন্ত সময়কালে বাংলায় সতীর সংখ্যা সাকুল্যে ১২৮ জন। দ্বিতীয়ত, বিনয়ভূষণ রায়ের Socioeconomic Impact of Sati in Bengal and the Role of Raja Rammohun Roy গ্রন্থ থেকে জানা যায়, ১৮১৫-১৮২৭ সময়কালীন বাংলার মোট ৫,৩৮৮ জন সতীর মধ্যে তিন উচ্চবর্ণ পরিবারের ছিলেন ৩,০৭৯ জন। এঁদের মধ্যে ছিলেন যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ২০৭১ (৩৮%), কায়স্থ ৮০০ (১৫%) ও বৈদ্য ২০৮ (৪%) জন। বাকি ২,৩০৯ জন অন্ততপক্ষে ২০টি ভিন্ন জাতির বিধবা ছিলেন।

"প্রথম শিক্ষার আলো এল ব্রাহ্ম ধর্মের হাত ধরে। দেবেন্দ্রনাথ সেটা কিন্তু মুসলিম ধর্ম থেকে পেয়েছিলেন, সুফিদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তার পরে বিদ্যাসাগর এটাকে অনেক বেশি এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তিনি নিজের পয়সা খরচ করে মেয়েদের অনেক স্কুল করেছিলেন। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে, ইওরোপিয়ানদের কাছে আমাদের একটা ঋণ আছে। এটা আমাদের না মানলে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা হবে"। - বাংলায় নারীশিক্ষার প্রথম উদ্যোগ ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের। ১৮১৯ সালে স্থাপিত 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'-র অর্থানুকূল্যে কলকাতার গৌরীবাড়িতে প্রথম অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। অবশ্য বাংলাতে ব্রাহ্ম ধর্মের উৎপত্তির অনেক আগে থেকেই পাঠশালা ও মক্তবের অস্তিত্ব ছিল। যেসব পড়ুয়া প্রধানত গরিব, তারা পাঠশালায় পড়ত। কিন্তু যারা তাদের থেকে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তারা গৃহে শিক্ষাগ্রহণ করত। ১৮৩৫ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম তাঁর শিক্ষাসমীক্ষায় বিদ্যালয় শিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষা (domestic instruction) প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে ২৩৫ জনপিছু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেন। তাঁর প্রতিবেদনে দেশজ শিক্ষাব্যস্থার

অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটিকে চিহ্নিত করে তিনি জানান: "মুসলমান শিক্ষকদের [অধীনে] হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমান শিক্ষার্থীরাও আছে। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রবৃন্দ এবং নানা [ধর্ম ও] জাতের শিক্ষকেরা একই বিদ্যালয় গৃহে সমবেত হয়, একই শিক্ষকের কাছ থেকে একই রকমের শিক্ষা লাভ করে এবং একই ধরনের খেলাধুলো ও বিনোদনে অংশ নেয়।"

দেশীয় ব্যক্তি হিসাবে দেবেন্দ্রনাথ নন, রামমোহন ১৮১৬ সালে হেদুয়ার নিকটবর্তী শুঁড়িপাড়ায় একটি ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শুঁড়িপাড়া বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্তির পরে উচ্চ ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য, তাঁর মানিকতলার বাড়িতে ছিল আরেকটি বিদ্যালয়। এটিই অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে পরিচিত। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ এবং রামমোহন-অনুগামী দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন এই বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের ছাত্র। দক্ষিণবঙ্গের মডেল স্কুলগুলির 'বিশেষ' পরিদর্শক হিসাবে বিদ্যাসাগরের সক্রিয় উদ্যোগে ১৮৫৭-র নভেম্বর থেকে ১৮৫৮-র মে অর্থাৎ মাত্র ৭ মাসের মধ্যে, হুগলির বিভিন্ন গ্রামে ২০টি, বর্ধমানে ১১টি, মেদিনীপুরে ৩টি ও নদীয়ায় একটি মিলিয়ে মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলির জন্য মাসে খরচ হত ৮৪৫ টাকা, ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় ১,৩০০ জন। যদিও বিদ্যালয়গুলির যাবতীয় আর্থিক দায়ভার বহন করত সরকার, বিদ্যাসাগর নন।

২

বাংলায় সামন্ততন্ত্র বিষয়ে আহমদ ছফা-আবদুল রজ্জাককের আলাপ, 'যদ্যপি আমার গুরু' সূত্রে

একদিন বিকেলবেলা রজ্জাক স্যারের কাছে গিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করলাম। বললাম, স্যার বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক অবস্থান কোথায়? এটা আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ একথা সত্যি?

...বললেন, ইন দ্য স্ট্রিকটেস্ট সেন্স অভ দ্য টার্ম ইন্ডিয়াতে কোন ফিউডালিজম আছিল না। বেঙ্গলের কথা ত এক্কেবারে আলাদা। বেঙ্গলের কথায় পরে আইতাছি। তার আগে রেস্ট অভ দ্য ইন্ডিয়ার খবর লই।

ফিউডালিজম অইল একটা ক্লোজড সিস্টেম। বংশপরম্পরা একটা পরিবার স্থায়ী অইয়া একটা জায়গায় বাস করব। তার ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার সব আলাদা। এক জায়গার মানুষ অন্য যায়গায় যাইবার পারব না। কাঁঠালের যেমন কোয়া, ফিউডাল সিস্টেমের সামন্তের জমির সঙ্গে সকলের তেমন সম্পর্ক। সামন্তরা অইল নিজের জমিদারিতে সমস্ত দণ্ডমুণ্ডের মালিক। রাজসভায় ঠিকমত হাজিরা দিতে পারলে আর যুদ্ধের সময় ঠিকমত সৈন্য পাঠাইবার পারলে এক্কেবারে সাত খুন মাফ। ইন্ডিয়াতে মোগল আমলের কথা ধরেন, জমিদারি এখানে বংশানুক্রমিক আছিল না। সম্রাট ইচ্ছা করলে জমিদারের পোলারে জমিদার নাও বানাইতে পারতেন।

আর যদি বেঙ্গলের কথায় আইয়েন, তাহলে এক্কেবারে অন্য কথা বলতে অয়। পুরানা বাংলা পুঁথিতে দেখা যায় বাংলার বাণিজ্যবহর জাভা সুমাত্রা এইসকল অঞ্চলে যাওয়া-আসা করছে। যেখানে বাণিজ্য এইরকম সচল থাকে সেই সমাজটারে অন্য যা ইচ্ছা কইবার চান কন, কিন্তু ফিউডালিজম বলবার পারবেন না। ভইটফোগেলের হাইড্রলিক থিয়োরি বেঙ্গলের বেলায় এক্কেবারে খাটে না।

আমি বললাম, তা হলে বেঙ্গলের সমাজের নেচারটা কী?

স্যার বললেন, যা ইচ্ছা কন, কিন্তু ফিউডালিজম কইবার পারবেন না। ইন্ডিয়ার অন্যান্য প্রোভিন্সে যেটুকু ফিউডালিজমের চিহ্ন খুঁইজ্যা পাওন যায়, বেঙ্গলে তার ছিটাফোঁটা পাইবেন না। গ্রামগুলার ফরমেশন দেখলেই বুঝতে পারবেন। এইখান থেইক্যা বিহারে যান, দেখবেন সীন এক্কেবারে পাল্টাইয়া গেছে।

ফিউডালের অবস্থানের চাইর পাশেগোটা গ্রামবাসীর বসবাস। বেঙ্গলে সেই সব আপনে পাইবেন না। আপনে কি মনসামঙ্গলের চাঁদ সওদাগরের কাহিনী পড়ছেন?

আমি বললাম, এক সময় বাংলা সাহিত্যের ছাত্র ছিলাম, সেই সুবাদে বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হয়েছে।

তা অইলে চাঁদ সওদাগরের কাহিনী আপনার জানা। বেবাক বাংলা সাহিত্যে এইরকম শিরদাঁড়ার মানুষ একটাও দেখছেন?

আমি বললাম, না, চাঁদ সওদাগরের মতো শক্তিশালী চরিত্র বাংলা সাহিত্যে একেবারে বিরল। মাইকেলের মেঘনাদকেও চাঁদ সওদাগরের পাশে ম্লান দেখায়।

স্যর বললেন, চাঁদ সওদাগরের চরিত্রের এই যে ঋজুতা এইডা অইল সমুদ্র বাণিজ্যশক্তির প্রতীক।

আমি আমার মূল প্রশ্নে ফিরে গেলাম, উনারা (কমরেড আবদুল হক) যে বলছেন, পূর্ববাংলা আধা-সামন্তবাদী আধা-উপনিবেশবাদী।

স্যর ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, ওরা যদি গায়ের জোরে কইবার চায় আপনে কী করবেন, মারামারি করবেন নিহি?।

৩।

যদুনাথ সরকারকে উল্লেখ করে অমিয়বাবুর ইওরোপিয়দের যুদ্ধপ্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকার তত্ত্ব

কিন্তু এন্ড্রু ডি লা গারজা, 'দ্য মুঘল এম্পায়ার এট ওয়ার - বাবর, আকবর এন্ড দ্য মিলিটারি রেভলিউশন ১৫০০-১৬০৫'এ বলছেন মুঘল সাম্রাজ্য আমলাতন্ত্রকে নতুন নীতিতে গড়েছে। আমলাদের জবাবদিহি বাধ্যতামূলক ছিল। মনসবদারদের কাজকর্মে নিয়মিত নজরদারি হত - শুধু সংখ্যা গোনা নয় পশুর চরিত্র আর দেহের পরিচিতি চিহ্নও খাতায় নথিবদ্ধ হত। তুর্কিদের যুদ্ধ-রণনীতি তার মত করে আদলবদল করে ভারতবর্ষের মাটিতে রোপন করেন বাবর। এই বৈজ্ঞানিক, পরিষ্কারভাবে তৈরি করে দেওয়া নির্দেশাবলীর রণনীতিটি পরের দিকে আয়েসে ডুবে থাকা তার বংশধরেরা বহুদিন পর্যন্ত অনুসরণ করেছেন এবং শেষের দিকে উন্মার্গগামী সন্তানের মত ধ্বংসও করেছেন। বাহিনীর অগ্রভাগে থাকত ভয়ডরহীন একদল শক্তিশালী সেনা - আজকের ভাষায় কমান্ডো, যারা যে কোনও মূল্যে সেনাপ্রধানের নির্দেশ প্রতিপালনে অসামান্য দক্ষ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আগ্নেয়াস্ত্রধারী সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ হওয়ার আগেই যুদ্ধক্ষেত্রের আশেপাশে মোতায়েন করা হত। এদের আগে থাকত আগ্নেয়াস্ত্র বিহীন ধনুর্ধারী ঘোড়সওয়ারের দল যারা এদের সঙ্গে মিলে শুরুর দিকে শত্রুর বিরুদ্ধে, তার এলাকায় ঢুকে ছোটখাটো লড়াই ঝগড়া বাধানোয় মাহির ছিল। পিছনে থাকত মূল দল - ডান আর বাঁ উইং এবং কেন্দ্র (যেখানে থাকত বাহিনী সব থেকে শক্তিশালী আধিকারিক, সেনা এবং সর্বপ্রধান নির্দেশক, অনেক সময় সম্রাট স্বয়ং বা খানজাদা, যিনি হাতির পিঠে চেপে মূল যুদ্ধ পরিচালনা করবেন) বিশিষ্ট বিশাল বাহিনী। সবার পিছনে থাকত রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান, প্রয়োজনে তাদের যুদ্ধে সামিল করা হত। যত দিন গিয়েছে এই সাধারণ ব্যবস্থাপনা কাঠামো আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে, উইং বাহিনীকে আরও বহু ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উইংগুলোকে আর উইং কেন্দ্রে ভাগ করা হয়েছে ইত্যাদি, কিন্তু বাবরের তৈরি মূল মুঘল যুদ্ধ কাঠামো বজায় থেকেছে অন্তত দুশো বছর, উপনিবেশের আগের সময় পর্যন্ত। অষ্টাদশ শতাব্দের মাঝের সময় পর্যন্ত এমন কি শেষের দিকেও দেশিয় আর ইওরোপিয় সামরিক প্রযুক্তি তুল্যমূল্য ছিল

অমিয় কুমার বাগচী -র উপনিবেশবাদ এবং ভারতীয় অর্থনীতি বই-এর ভূমিকা, ‘স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্ট নীতিই উপনিবেশিক শাসন - দখলদারি, সংগঠন এবং উদ্বর্তন’-এর সংক্ষিপ্তাকার

সাম্রাজ্যের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এবং সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিকোণ

১। মার্কসবাদী এবং বিশ্ব-ব্যবস্থা তাত্ত্বিকদের দীর্ঘদিনের দাবি, ইওরোপীয়দের আমেরিকা ‘আবিষ্কার’ আর এশিয়ায় যাবার মহাসাগরীয় বাণিজ্য পথ দখলদারির সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদ তার চালিকাশক্তি আহরণ করেছে, এবং এই সাম্রাজ্যবাদ সাধারণভাবে বিজীত মানুষদের জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

২। স্বঘোষিত মার্কসবাদী বিল ওয়ারেন মনে করেন সাম্রাজ্যবাদ প্রগতিশীল শক্তি। তাদের দাবি বড় শিল্প, বিশালকায় বাণিজ্যকর্ম অর্থাৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগের বাড়বাড়ন্তই যে কোনও ভূখণ্ডের জন্য ইতিবাচক ঘটনা। উপনিবেশের ফলে সাবসিস্টেন্স কৃষির বাড়বাড়ন্ত, সামাজিক কাঠামো ধ্বংস হওয়া, জনগণের জীবনের মানের পতন ইত্যাদি ঘটবাবলী তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। প্রিমিটিভ একিউমুলেশনকেও তারা অস্বীকার করেন। প্রিমিটিভ একিউমুলেশনের তত্ত্বকে ডেভিড হার্ভে বলছেন accumulation by dispossession, উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে পুঁজি সঞ্চয়। সেই প্রক্রিয়ায় একদিকে অগ্রগামী পুঁজিবাদী দেশের কৃষকরা বিপুল ক্ষতির [এবং উচ্ছেদও] মুখোমুখি হচ্ছে তেমনি ইওরোপিয় উপনিবেশের অ-শ্বেতাঙ্গ জনগণ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন। ভারতবর্ষ থেকে পাঠানো রাজস্ব উদ্বৃত্তে ফরাসি বিজয় ঘটেছে।

৩। মরিস ডেভিড মরিস-এর প্রতিপাদ্য, ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ প্রভূত লাভবান হয়েছে। মরিসের তত্ত্ব-যুক্তি The Cambridge History of India, vol. 2 নিলেও ক্রিস বেইলি স্বীকার করেছেন ভারতবর্ষের অর্থনীতি পর্যায়ক্রমে অতলে তলিয়েছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে বৃহত্তর কর্তৃত্ববাদের উত্থান ঘটেছে, বিদেশি প্রশাসকেরা স্থানীয়দের মাথায় বসে স্থানীয়দের অবদমিত, ধ্বংস করেছে।

৪। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদী দৃষ্টিভঙ্গি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, তার লুঠেরা ভূমিকা খুলে ধরেছেন।

৫। অমিয় বাগচী বলছেন, তিনি এই বইতে দেখাতে চাইছেন পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার অনিবার্য ফল রাষ্ট্রশক্তির সাহায্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান; উপনিবেশ থেকে সম্পদের লুঠ নিশ্চিত করার ফলে ব্রিটেন এবং অন্য পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর বিশ্বজোড়া আধিপত্য তৈরি হওয়া, সেই আধিপত্যের ফলে উপনিবেশিক

শাসনে কিভাবে ভারতে বিধ্বংসী ক্রিয়া তৈরি করল তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিণতি বিশ্লেষণ।

৬। তাঁর দাবি উপনিবেশকালে নাগরিক সমাজের উত্থানের দাবি স্রেফ মিথ।

৭। উপনিবেশিক শাসনে জনগণের সব কটি অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য বঞ্চনার প্রক্রিয়া সংহিতাবদ্ধ করা হল, বর্ণবাদ জুড়ে বসল, জাতিগত বৈষম্য স্থায়ী হল।

৮। সম্পত্তিতে মেয়েদের অধিকার কেড়ে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম হল।

৯। দক্ষিণ ভারতের বহু অঞ্চলে জমিদারিতে Agrestic serfs, কৃষি নির্ভর বন্ধুয়া দাস ব্যবস্থা নিষিদ্ধ করে নি উপনিবেশ, ভূমি রাজস্ব ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার আতঙ্কে। ধ্বংস হওয়া কারিগর উৎপাদন কাঠামোর উদ্বৃত্ত শ্রমিক সমুদ্রপারের দেশগুলোয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।

১০। ব্রিটিশ রাষ্ট্র তাঁতি এবং অন্য কারিগরদের স্বাধীনতা কেড়েছে, শ্রমিককে বাধ্য করেছে পেটচুক্তিতে সরকারী কাজ করতে, বাগিচা মালিকদের চুক্তিবদ্ধ শ্রমের অনুমতি দিয়ে চুক্তি লঙ্ঘন করা শ্রমিকদের গ্রেপ্তারের অধিকার দিয়েছে। ব্রিটেনে দীর্ঘকাল ধরে ফেলে রাখা মাস্টার্স অ্যান্ড সার্ভেন্টস অ্যাক্টের জবরদস্তিমূলক বিধান ব্যবহার করেছে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে।

১১। উপনিবেশিক দখলদারিত্বের আদর্শ দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব না থাকার মিথ তৈরি করে জনগণের জমির অধিকার কেড়েছে, এজমালি জমিতে রাজস্ব আদায় করেছে, কেড়ে নেওয়া জমি বাগিচা আর রেল কোম্পানির হাতে তুলে দিয়েছে।

১২। ব্রিটিশরা administration and justice-এ least-cost structure বজায় রাখার ফলে বহু জাতিগত নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়িত হয়েছে; মহিলাদের অধীনে রাখার আইন এবং রীতিনীতি বাস্তবায়িত করায় নারী দলিত এবং নিম্নবর্ণের অধিকার খর্ব হয়েছে; তাই অধিকার আন্দোলনের কর্মীদের যৌথভাবে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী এবং উপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। দক্ষিণ ভারত এবং অন্যত্র, উপনিবেশিক আদালত, বহু গোষ্ঠীর পাবলিক ডোমেনের অধিকার সংকুচিত করে নির্দিষ্ট বর্ণের অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে।

১৩। নায়ারদের [এবং বাংলাতেও] মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার কেড়ে পুরুষদের হাতে তুলে দিয়েছে।

১৪। দেওবন্দ ঘরানা ইসলামকে স্থানীয় প্রভাব অর্থাৎ অশুদ্ধ প্রক্ষিপ্তি থেকে মুক্ত করে উপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আক্রমণ প্রতিহত করার আন্দোলন তৈরি করেছে। বাংলায়, ব্রহ্মপুত্র গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দুর্গম ভূখণ্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই অভিজাতদের মধ্যে উর্দুভাষী মুসলমানরা, সংস্কারবাদী আন্দোলনের রাজনৈতিক উপযোগিতা স্বীকার করেছে। বাংলায় দেশ ভাগ আন্দোলনের সফলতা দরিদ্র মুসলিম কৃষকদের

অসন্তোষের ফল। তাদের একটা বড় অংশ হিন্দু জমিদারদের প্রধান শত্রু হিসাবে দেখত। হিন্দু মৌলবাদের উত্থান, তথাকথিত গো-রক্ষা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার, পেশাদার মুখপাত্র এবং উপনিবেশিক আমলে একাধিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার হিন্দু কৃষকদের মধ্যে একই মিথস্ক্রিয়া দেখা গেল।

১৫। উপনিবেশিক শাসনে দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে ১৮২০ থেকে ১৮৫৫র মধ্যেকার দীর্ঘ সময়কালে অর্থনৈতিক মন্দায় সমাজে পরম্পরা জাঁকিয়ে বসেছে। ১৮২০ থেকে ১৮৪০এর দশকজুড়ে দামের পতনের ফলে মন্দা স্থায়ী হওয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষ প্রভাবিত হল, বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটল এবং স্থানীয় জমিদার এবং তাদের জাতের ক্ষমতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেল।

১৬। দুই শতাব্দীর বিশ্বব্যাঙ্ক-আইএমএফ-এর আঙ্গিকে স্ট্রাকচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SAP) অপ্রতিহতগতিতে রূপায়িত হয়েছে; কোথাও পণ্যের দাম মাটি ধরেছে, কোথাও ব্যাপক মূল্যস্ফীতি ঘটেছে, যেমন আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, দুটি বিশ্বযুদ্ধ, ১৮৯৬ থেকে ১৯১৩র মধ্যে আয় আর জীবনযাত্রার মানে দীর্ঘমেয়াদী পতন প্রবণতা দেখতে পাই। উপনিবেশিক SAP-এর প্রভাবে, লক্ষ লক্ষ কারিগর জীবিকা হারিয়েছে, কৃষিতে উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার বিনিয়োগ কমেছে, উপনিবেশিক ভারতে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যজাত লাভ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে, না হয় তাদের ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

১৭। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ ছিল ১৭৬৯এর বাংলায়, দক্ষিণ ভারতে ১৭৮০-এর দশক থেকে ১৮৩০-এর দশক পর্যন্ত, ১৮৭০-এর দশক থেকে ১৯০০-র দশকের শুরুর সময়ে পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে, [তিনি বিংশ শতের চারের দশকের বাংলার গণহত্যা/দুর্ভিক্ষের কথা লিখতে ভুলেছেন] বহু ছোট-খাটো দুর্ভিক্ষ সরকারীস্তরে নথিকৃত হয় নি।

১৮। উপনিবেশে বিল্পায়ন হল অর্থনীতির পতনের অন্যতম দৃশ্যমান দীর্ঘমেয়াদী চলক। কোনও দেশের 'বি-শিল্পায়ন'-এর অর্থ, সেকেন্ডারি শিল্প [যে সব শিল্প কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ করে পণ্য উৎপাদন করে] থেকে কর্মী হ্রাস ঘটেছে, রোজগার হ্রাস পেয়েছে।

মনোপলির লুণ্ঠন: ১৬৯০ থেকে১৭৫০ এর দশক পর্যন্ত পূর্ব ভারত বাণিজ্য

১৯। সপ্তদশ শতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দক্ষিণ এশিয়া, ইস্ট এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলের বাণিজ্যে ব্যাপক লাভ করছিল। রয়াল আফ্রিকা কোম্পানির প্রধান আমদানি ছিল আফ্রিকার দাস। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মূল আমদানি ছিল বস্ত্র, সোরা। একই সঙ্গে জাহাজ উৎপাদন বাড়ল [ইন্দ্রজিৎ রায় দেখিয়েছেন জাহাজ তৈরি আর মাল্লা সংগ্রহতেও সংরক্ষণ কায়েম করে বাংলার জাহাজ শিল্প ধ্বংস করল সাম্রাজ্য]। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এশিয়ায় বড় রপ্তানি ছিল দামি ধাতু - সোনা আর রূপো। সপ্তদশ শতকে ইংলন্ডে আমদানি করা কাপড় বিশ্বজুড়ে নতুন করে রপ্তানি করা হত কারন

এই শতাব্দের শেষের দিকে ক্রমশ পূর্বের দেশগুলো থেকে ইংলন্ডের ভূমিতে কাপড় আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হচ্ছিল।

২০। ব্রিটিশ, ফরাসি আর ডাচেরা বাংলা তথা ভারতীয় সুতিতে অভ্যস্ত হতে শুরু করে। গরমে পশমের কাপড় পরা কমতে থাকে - ফ্যাশানে পরিবর্তন ঘটে [এই অভিজ্ঞতা রিজেন্সি আমলের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে]। ১৭২০র পরে ক্যালিকো আমদানি নিষিদ্ধ করা হল।

উপনিবেশের অর্থই স্ট্রাকাচারাল এডজাস্টমেন্ট

২১। ১৭৫০এর দশকে বিশ্বের ২৫ শতাংশ শিল্প উৎপাদন করত দক্ষিণ এশিয়া [বাংলার অংশিদারি ছিল তার ২৫ শতাংশ] চিন একতৃতীয়াংশ।

২২। দুই অঞ্চলেই রাষ্ট্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, হস্তান্তর আর উত্তরাধিকার নিশ্চিত করত স্থানীয় প্রথা, আর রাষ্ট্রীয় আইনে। রাষ্ট্র সহজে জমির অধিকারে মাথা গলাত না। ইংলন্ড, নেদারল্যান্ডে রাষ্ট্র সম্পত্তির অধিকার সংকুচিত করল; সম্পত্তির অধিকার তুলে দিল সংখ্যালঘিষ্ঠ অলিগার্কদের হাতে - চিনে আফিম যুদ্ধ পর্যন্ত আর ভারতবর্ষে/বাংলায় ১৭৬৫ পর্যন্ত জমিদারেরা এই অধিকার কায়েম করতে পারে নি।

২২। ভারতবর্ষ ছিল দ্বিতীয় বড় শিল্প উৎপাদক অঞ্চল। ইওরোপিয় শক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই ভূখণ্ড দখল এবং এই কাজে তারা সফল হয়।

২৩। বাংলায় শেষ স্বাধীন নবাবের পতনের ষাট বছরের মধ্যেই দক্ষিণ এশিয়া পরিণত হল কৃষি আর অনুন্নত দেশে।

২৪। Henry St. George Tucker Sr -এর মত, ক্লাইভের মত, হেস্টিংসের মত প্রশাসকেরা রাজস্ব লুঠ প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন এবং উপনিবেশের প্রথম ৬ দশকের সম্পদ লুঠ ভারতবর্ষকে অনুন্নত দেশে পরিণত করে।

২৫। কৃষি আর শিল্প ক্ষেত্রে কাঠামোগত পরিবর্তন বিনিয়োগের তীব্র মন্দার পরিবেশ তৈরি করল। ১৭৬৫ থেকে সরাসরি রাজস্ব লুঠ করে মেট্রোপলিটনে পাঠাবার প্রক্রিয়া শুরু হল। ভারতজুড়ে বি-শিল্পীকরণের সাথে কৃষিতেও মন্দা দেখা দিল। সম্পত্তির অধিকার এবং আইনী প্রতিষ্ঠানগুলির মৌলিক পরিবর্তন করা হল।

২৬। নিরন্তর সম্পদ লুঠের ফলে অর্থনীতিতে চাহিদা-সরবরাহ প্রক্রিয়া ব্যহত হল, বাজারের পতন ঘটল; বলপ্রয়োগ করে বা পরোক্ষে বিশিল্পায়ন হল। উদ্বৃত্ত কারিগরেরা কৃষিতে জুটলেন আর কিছু দেশ-বিদেশে বন্ধুয়া মজুরে পরিণত হলেন।

২৭। ১৭৫৭র পর দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবসা করতে আর ইওরোপ থেকে সোনা রূপো আসে নি। চাষী কারিগর হকারদের দেওয়া ভূমি রাজস্ব ব্যবহার করে তাদেরই পণ্য কম দামে কিনে সারা বিশ্বে বিক্রি করে বিপুল উদ্বৃত্ত তৈরি হল।

২৮। বন সংরক্ষণের নামে বনে-জঙ্গলে থাকা মানুষদের উচ্ছেদ করে দেশ, বিদেশের

বাগিচা কৃষিতে প্রায় দাস - বন্ডেড শ্রমিক বানানো হল। এদের ব্যবহার করা হল পতিত জমি হাসিল করতে।

২৯। উপনিবেশের লুঠ, দখলদারি আর গণহত্যার ধাক্কায় বহু সমাজ উচ্ছেদ হল, নির্মূল হল।

৩০। কোম্পানি আমলে ভূমি রাজস্ব লুঠ করল, লবন, সুপুরি, আফিমে একচেটিয়া ব্যবসা থেকে বিপুল উদ্বৃত্ত মেট্রেপলিটনে গেল।

৩১। ১৭৫৭ থেকে ১৮১৮ পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে বাংলার অর্থে যুদ্ধ চলেছে - বিভিন্ন অঞ্চল পদানত করে 'শান্তি' প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

৩২। ১৭৭০ থেকে ১৯৪০এর দশক পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ায় অগণিত দুর্ভিক্ষে [জ্ঞানগঞ্জের ভাষায় গণহত্যা] কোটি কোটি [হিকেল আর সুলিভান Dylan Sullivan, Jason Hickel, Capitalism and extreme poverty: A global analysis of real wages, human height, and mortality since the long 16th century বলছেন - ১৮৮১ থেকে ১৯২০র মধ্যে প্রতি বছর ১৩ থেকে ৪১ লক্ষ, মোট ৫ থেকে ১৬.৫ কোটি মানুষকে উপনিবেশ হত্যা করেছে] মানুষ মারা গিয়েছেন।

৩৩। ১৭৫৭র পরে আফিম, সুপুরি, নুন, ১৮৪০এর পরে আখ, নীল, চা, কফি উৎপাদনে প্রায় দাস প্রথা ফিরিয়ে আনা হল।

৩৪। অমিয়বাবু লিখছেন That structural adjustment involved the severe depression of investment in both agriculture and industry and also required radical alteration of the modes of-extraction of the tribute. De-industrialization in India was accompanied not by reallocation of normally growing resources to agriculture but the depression of growth rates of both industry and agriculture. Structural adjustment also, of course, required some basic changes in property rights and legal institutions.

৩৫। তিনি আরও লিখছেন, The resurgence of a neocolonial view that somehow India thrived under British rule is based on wilful illiteracy and total insensitivity to the deaths of tens of millions of Indians in famines and indirectly, of several hundred millions in avoidable malnutrition and epidemic diseases and a structural retrogression of the economy that squeezed both the base of and incentives for domestic investment in industry and even more, in agriculture. The neocolonial, largely phantasmagoric, perspective utilizes the supposed lack of systematized data on the Indian subcontinent for most of the period and picks out some features that seem to favour their view.

৩৬। ১৮২০র পরে বিশিল্পায়ন, রপ্তানি-নিষেধাজ্ঞা, মেট্রোপলিটনে কারখানাজাত পণ্য উপনিবেশে বাজার দখল করায় কাপড় আর সুতোর রপ্তানিতে বিপুল ঘাটতি আসে, স্থানীয় বাজার দখল হয়, কারিগরদের কারখানা বন্ধ হয়। লক্ষ লক্ষ মহিলা কাটনি কাজ হারান [১৮২০তে ঢাকা জনশূন্য হল]।

৩৭। বিভিন্ন অঞ্চলের মুদ্রায় সার্বিক ডিমোনিটাইজেশন ঘটানো হল।

৩৮। ১৭১৬-য় ৭৪৬৮৯০ পাউন্ডের রূপো দক্ষিণ এশিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। অথচ ১৭৫৭-১৭৯৭ পর্যন্ত এক আউন্সও রূপো দক্ষিণ এশিয়ায় আসে নি। এই অঞ্চলের চাষী-কারিগরদের দেওয়া ভূমি রাজস্ব ব্যবহার করে তাদের পণ্য কম দামে কিনে, সে সব পণ্য ইওরোপের নানা দেশে রপ্তানি করে বিপুল ব্যবসা উদ্বৃত্ত তৈরি করেছে কোম্পানি সাম্রাজ্য। ১৭৮৭ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত টিপু আর মারাঠাদের বিরুদ্ধে ওয়েলেসলির যুদ্ধ পরিকল্পনা সাকার করতে বাংলার রাজস্ব ছাড়াও লন্ডন থেকে রূপো আমদানি করতে হয়েছে।

বিভিন্ন প্রেসিডেন্সির রাজস্ব সংগ্রহ

৩৯। গবেষক এস্তাবান কুয়েনকা সূত্রে অমিয়বাবু বলছেন ১৭৯৩ থেকে ১৮০৭ পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে বার্ষিক ৩৩৫৪৯৯৯ পাউন্ড ব্রিটেনে গিয়েছে [এটা মূলত বাংলা লুঠই]। এর সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে-খরচ ধরতে হবে। বাংলা-বিহারের মোট জিডিপির ৭.০৭ শতাংশ প্রতি বছর লন্ডনে সরাসরি রপ্তানি হয়েছে। তিনি লিখছেন We should remember that the industrializing economy of England was not investing much more than 7 per cent of its GDP during precisely the decades that India was fast changing from an economy with a substantial share (ranging ·from 15 to 20 per cent) of the manufacturing sector in the GDP and employment of the economy to one in which that share fell well below 10 per cent over the course of the nineteenth century. The continual disinvestments or drain, to use a word that both early British observers and nationalists used, meant that the production function was being continually pushed inward, and people survived, when they did, by mining the land. without replacement of its nutrients, by adapting to lower value-added products that had a domestic but no international market, and in some favourable situations and conjunctures, competing successfully with the privileged Europeans।

৪০। কোলব্রুক এবং ল্যাম্বার্ট-এর ৪০ বছরে ৬০ মিলিয়ন স্টার্লিং পাউন্ড লুঠ তথ্যের প্রতিধ্বনি করছেন কুয়েনকা। এর ফলে বাংলা-বিহারের জনগণ অপুষ্টিতে ভুগেছে।

৪১। উৎসা পট্টনায়েক আর কুয়েনকা এস্তেবান দেখিয়েছেন এবসোলিউট ভ্যালুতে এই লুঠের পরিমান আরও বিশাল। কুয়েনকা বলছেন, বাংলা লুঠ করা অর্থেই ব্রিটেন

ফ্রান্সকে হারাল এবং জগৎকর্তৃত্ব তৈরি করল। অমিয়বাবু ক্রিস বেইলিকে উদ্ধৃত করছেন ' ... the 1770s and 1780s were a British recessional ... In 1783, the First British Empire of American settlement and oriental trade seemed to have foundered into ruin. Worse, it seemed to attract resources and energy away from the more pressing problems of domestic development. Fresh military and diplomatic disasters dogged the years of war against revolutionary France.

By 1815 the, nation could celebrate an astonishing, indeed providential recovery of fortunes, Great Britain had finally managed to engineer a coalition of European powers to oppose French power within Europe।

পার্লামেন্ট শাসনে কাঠামো পুনর্বিন্যাস প্রকল্প

৪২। মার্ক্সকে উদ্ধৃত করে অমিয়বাবু বলেছেন মুঘলদের মত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজস্ব আদায় করলেও তাদের মত কোম্পানি এদেশে এক ফার্দিংও খরচ করে নি।

৪৩। অমিয়বাবু বলছেন লুঠ আর লাভ মিলিয়ে তার হিসেবে ১৮৭০ থেকে ১৯১৫-১৬ পর্যন্ত ভারতবর্ষ আর বার্মা থেকে কম করে ১৮৭০এর দশকে বছরে ২১.৪ মিলিয়ন পাউণ্ড আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময় পর্যন্ত ৫২.৯ থেকে ৬৫.৩ মিলিয়ন পাউন্ড সাগরপাড়ে গিয়েছে।

৪৪। ১৯১৩-১৪ পর্যন্ত ব্রিটেন পৃথিবীজুড়ে ৪০০০ মিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগ করেছিল। ভারত থেকে মাত্র ৪ শতাংশ সরল সুদে উপনিবেশিক উদ্বৃত্ত ছিল ৩১৯৯৩২০ থেকে ৩৭৭৯২৬৪ পাউন্ডের মধ্যে একটা অঙ্ক। এই অঙ্ক ব্রিটেনের মোট বিশ্ব বিনিয়োগের ৭৫ থেকে ৯৫ শতাংশ। এর সঙ্গে জুড়ে আছে ইংরেজিতে কথা বলা অঞ্চল যেমন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডের অভিবাসিত হওয়া ব্রিটিশদের সমৃদ্ধি এবং সমান্তরালভাবে এই অঞ্চলের অ-সাদা মানুষের দুর্দশা বৃদ্ধি।

৪৫। এই সময়ে শুধু যে উপনিবেশে বাজারই ফেল করছে না, রোজগারের সুযোগ কম হচ্ছে না, একই সঙ্গে মুক্তবাজারের কথা বলে মুক্ত বাজার বিরোধী কাজ করেছে মেট্রোপলিটনগুলো। পাঞ্জাব এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভূমি রাজস্ব আদায়ে মধ্যস্থ নিয়োগ করে নি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য!

Table 1 Land Revenue of Different Presidencies of British India (in £s), 1792–1811

Year	Bengal	Madras	Bombay
1792–3	3,091,616	742,760	79,025
1800–01	3,218,766	957,799	45,130
1810–11	3,295,382	1,071,666	437,108

Source: Banerjea (1928: 187).

৪৬। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শুরুর সময় থেকে যেহেতু কৃষিতে সেচের মত ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বন্ধ হয়েছে, চাষীরা মহাজনের কাছে উত্তমর্ণ হতে বাধ্য হয়েছে।

কৃষি উৎপাদকতা এবং চাষে পরিবর্তন

৪৭। অমিয়বাবু বিশদে বর্ণনা করেছেন কেন উপনিবেশে কৃষি নিয়ে জর্জ ব্লাইন, ক্লাইভ ডিউয়ি, এলান হেস্টনের তথ্য অশোক দেশাই, সতীশ মিশ্র, সুমিত গুহ মানতে অস্বীকার করেছেন।

৪৮। কোলব্রুক ল্যাম্বার্টের তথ্য ভিত্তি করে অমিয়বাবু ১৯০০-র দামস্তরে ১৭৯৪এর মাথাপিছু জিডিএমপি ['জিডিএমপি হচ্ছে মেটিরিয়াল প্রডাক্ট, অর্থাৎ এগ্রিকালচার এবং ইন্ডাস্ট্রির মোট আউটপুট। আমি সারভিসেসটা ধরি নি, কারন সারভিসেস একটা প্রিইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকনমিতে সে ভাবে সেপারেটেড হয় না। এগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ডোমেস্টিকালি প্রডিউসড হয়, অথবা প্রডাকশানের সাথেই জড়িয়ে থাকে। সুতরাং অনেক বেশি রিলায়েবেল হল জিডিএমপিটাকে ধরা'] দেখিয়েছেন ৪৭.৪, সামগ্রিক ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ৩৩.২। শিবসুব্রহ্মনিয়ম বলছেন ১৯০০-০১এ প্রাথমিক এবং অপ্রত্যক্ষ্য ক্ষেত্রে চলতি দামে মোট মূল্য তৈরি হয়েছে ৯৬৭৯ মিলিয়ন টাকা। এই সংখ্যার সঙ্গে ২৮৪ মিলিয়ন ভারতবাসীর অঙ্ক ভাগ দিলে আমরা পাচ্ছি ৩৩.৭। মাথায় রাখতে হবে ১৭৯৪-এর আগের ৪০ বছর ধরে লন্ডনে রাজস্ব লুঠ হয়ে (অমিয়বাবু একে ট্রিবিউটারি এক্সট্রাকশন বলছেন) প্রায় নিঃস্ব হয়েছে।

৪৯। অর্থাৎ ১৭৯৪এর পরের এক শতাব্দে মাথাপিছু আয় ২৫ শতাংশের বেশি কমেছে।

৫০। তিনি হতাশ স্বরে বলছেন এত প্রমান থাকা সত্ত্বেও Many of the 'optimists' about Indian productivity or income growth tend to be casual about the processes that would sustain their optimism। ব্রিটিশ শাসনে চাষ না করলেও জমির মালিক হলেই ট্যাক্স ধার্য বাধ্যতামূলক হল। জঙ্গলবাসীরা জঙ্গলের ওপর অধিকার হারানোর সঙ্গে সঙ্গে চাষীরাও জলঙ্গলকে তাদের গবাদী চরার ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহারের অধিকার হারাল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে স্থানীয় কৃষির উন্নতিতে উদাসীন থাকায় জলাশয়গুলোয় ম্যালেরিয়া জীবাণুর চাষ হল। ব্যতিক্রম কাবেরী-গোদাবরী অঞ্চল ।

৫১। রায়তওয়ারি ব্যবস্থার জনক টমাস মুনরো ১৮০৭এ কৃষি উন্নতির লক্ষ্যে কোম্পানি কর্তাদের প্রস্তাব দিয়েছিলেন শুকনো আর শালি জমির মোট উৎপাদন শুল্কে ২৫ শতাংশ আর বাগান (গার্ডেন ল্যান্ড) উৎপাদনে একতৃতীয়াংশ ছাড়। তাঁর এই প্রস্তাব মাদ্রাজ সরকার প্রত্যাখ্যান করেছিল এই যুক্তিতে, ইংলন্ড থেকে নির্দেশ এসেছে বছরে আরও দশ লক্ষ স্টার্লিং পাউন্ড পাঠাতে হবে - এই অর্থ না পাঠালে কর্তারা প্রশাসনের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন।

৫২। ১৮২০ থেকে ১৮৫০এর মধ্যে দাম পতনের কারন বিপুল পরিমান অর্থ লুঠ।

জীবনযাত্রাস্তর আর উদ্বর্তন

৫৩। ১৮৭২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত জনসংখ্যা সব থেকে বেশি বেড়েছে নিম্নগাঙ্গেয় আর ব্রহ্মপুত্র অঞ্চলে - তার একটা বড় কারন হল নতুন জমি হাসিল করা।

শিল্প কাঠামো ধ্বংস/বি-শিল্পায়ন

৫৪। চার্লস মেটকাফ বি-শিল্পায়ন উল্লেখ করেছেন, রমেশ দত্ত বিশিল্পায়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। উল্টোদিকে ব্রিটিশ আমলে ভারতে শিল্পায়নের ধারণা দিয়েছেন দুই বিপরীত তাত্ত্বিক অবস্থানের ঐতিহাসিক - প্রথমজন নব্যউপনিবেশিক ঐতিহাসিক মরিস ডেভিড মরিস; দ্বিতীয়জন ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের থেকেও কঠোর অবস্থান নেওয়া ডানিয়েল থর্নার। থর্নারের বক্তব্য উপনিবেশের শেষের দিকে ভারতবর্ষে শিল্পায়নের যুগ শুরু হয়েছিল - আর যদি ধরেই নিই যে বিশিল্পায়ন হয়েছিল সেটা ১৮৮০র আগের সময়ে ঘটেছে।

৫৫। অমিয়বাবু বলছেন সমস্ত সহজলভ্য প্রমাণ অনুসরণ করে বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতজুড়ে ব্যাপক হারে বিশিল্পায়ন ঘটেছে। গাঙ্গেয় বিহারে শিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের সংখ্যা ১৮০৯-১০এ ১৮.৩ থেকে ১৯০১এ ৮.৫ শতাংশ হয়েছে। আমরা যদি ধরে নিই বুকানন হ্যামিলটন জেলাগুলোর জনসংখ্যা বাড়িয়ে ধরেছেন, তা হলেও উনবিংশ শতাব্দের শুরুতে সেকেন্ডারি ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করা জনসংখ্যা হয় ২১ শতাংশ। মাথায় রাখতে হবে বুকানন এবং রমেশ দত্ত উভয়েই বলছেন, বুকানন হ্যামিলটনের সমীক্ষা চলাকালীন সময়ে রপ্তানি কমছে এবং আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদাও কমছে।

৫৬। গাঙ্গেয় বিহার ব্যতিক্রম মনে হতে পারে - সেই সুবাদে তিনি ১৮০০র সময়ে হায়দারাবাদে কারিগরদের সমীক্ষার কথা উল্লেখ করছেন বিশিল্পায়ন প্রমান করতে। এই সময়ে হায়দারাবাদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে জুড়ে যায়। তিনি বলছেন, ১৮১০এ মোট জনসংখ্যার তুলনায় কারিগর ছিল ১৯ শতাংশ। কাডাপ্পা, কুরনুল, বেলারি, অনন্তপুর - এই চার জেলায় উনবিংশ শতকে কারিগরের সংখ্যা অর্ধেক হয়েছে - এই সংখ্যায় তিনি কৃষির সঙ্গে জুড়ে থাকা একাংশকেও কারিগর হিসেবে গণ্য করছেন।

৫৭। ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় সেকেন্ডারি শিল্পের সংখ্যা কমতে থাকে শুধু বিদেশি পণ্য প্রবেশের ফলেই নয়, স্থানীয় বাজারগুলোয় সেকেন্ডারি শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা পতনের ফলেও।

৫৮। বম্বে-ডেকান অঞ্চলে মন্দা শুরু হয়, বেকারি বৃদ্ধি পায়। ১৮২২ থেকে কৃষিদ্রব্যের দাম পড়তে থাকে ১৮২৩, ১৮৩৩, ১৮৪৫এ ব্যাপক ফসল নষ্ট হওয়ার কারনে এবং দাম পতন চলতে থাকে ১৮৫৩ পর্যন্ত। পেশোয়া বাহিনী ভেঙে দেওয়া, ব্রিটিশ পণ্যের অবাধ আমদানির ফলে শিল্প ধ্বংস হয় এবং কৃষকদের দুর্দশা বাড়ে।

৫৯। ক্লিঙ্গিনস্মিথ এবং উইলিয়ামসনকে উদ্ধৃত করে বলছেন বিশিল্পায়ন তত্ত্ব অস্বীকার

করার উপায় নেই। বিশিল্পায়ন ঘটেছিল ১৭৬০ থেকে ১৮৬০এর মধ্যেকার সময়ে। বিশিল্পায়নে মহিলাদের রোজগার, রোজগার সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়েছিল। লুইজি টিলি বলছেন চরকায় সুতো কাটা ছিল মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ রোজগার - তার কারন ছিল মহিলাদের একটা অংশ বাড়ির বাইরে কাজ করতে যেতেন না। মহিলাদের রোজগারে খামতি হওয়ার মেয়েদের পরিবার আর সমাজে স্বাধীনতায় ঘটতি পড়ল। বহু তাঁতি শস্তার কাপড় বুনলেন। ক্লিঙ্গিনস্মিথ এবং উইলিয়ামসন বলছেন, বিশিল্পায়নের ফলে অব্যবসাযোগ্য এবং কৃষি দ্রব্যের দাম বাড়ল। বিশিল্পায়ন শৃঙ্গে পৌঁছোয় ১৮২১ থেকে ১৮৫৪র মধ্যে কৃষি পণ্যের দাম কমার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে।

৬০। অশেষের সঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেছেন, কেন পশ্চিম ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজ বিশিল্পায়নের ধাক্কা সত্ত্বেও টিকে গেল।

সিদ্ধান্ত - কর্তাসত্ত্বা(এজেন্সি) এবং টিকে থাকা (সারভাইভ্যাল)

৬১। আশ্চর্য হল নব্যউপনিবেশিক অর্থনীতিবিদদের মনে হয়েছে উপনিবেশকালে কারিগর, চাষী কর্তাসত্ত্বা হারান নি। ফলে অর্থনীতি বা সামাজিক ইতিহাসে উপনিবেশ অপ্রাসঙ্গিক বিভাগ। তবুও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসনের কালপঞ্জি এবং এর আর্থিক বাধ্যবাধকতা প্রমান করে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূমি সম্পর্কের ধরণগুলো ধ্বংস করেছিল উপনিবেশ। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল উপনিবেশিক রাষ্ট্রের লুঠের মূল ভূখণ্ড, যুদ্ধ পরিকল্পনার কেন্দ্র - তাই ব্রিটিশরা সম্পদের উৎস-ভূখণ্ডকে স্থিতিশীল রাখার উদ্বেগে ভূমি রাজস্ব আদায় স্থায়ী করতে বিশ্বের সব থেকে দীর্ঘ সময় ধরে চলা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে। জমিদারেরা জমিদারিতে থাকতেন না, চাষীর ভালমন্দ দেখার প্রাথমিক দায় তার ছিল না, ফলে কৃষি উৎপাদকতা বিপুলভাবে কমে যায়।

৬২। সুদখোর মহাজনের রমরমা শুরু হয় জমির অধিকার ইনসিকিওর হয়ে পড়ায়।

৬৩। ক্রমশ উদ্বৃত্ত কিছু মানুষের হাতে জমতে শুরু করে - এমন কি আসামের মত বিপুল বিশাল কৃষি ক্ষেত্র অঞ্চলেও এটা ঘটেছে।

৬৪। বিংশ শতকে বাংলার পূর্বাঞ্চলে হিন্দু জমিদার বা পেশাদারেরা চাষী বিরোধী

Table 2 Proportion of Population Dependent on Secondary Industry in Four Districts of the Madras Presidency, in 1901

District	Percentage of actual workers to total population	Percentage of workers, including partially agriculturists, to total population
Cuddapah	7.81	8.58
Kurnool	7.85	8.80
Bellary	8.90	9.48
Anantapur	9.02	9.51

Source: Table XV, 'Occupations', *Census of India 1901, Vol. XVA, Madras, Part II, Imperial Tables*, by W. Francis, Madras: Superintendent, Government Press, 1902.
Note: The figures of secondary sector workers have been taken as those pertaining to Class D, 'Preparation and supply of material substances'.

ভাড়াটিয়া শর্ত বদলাতে অস্বীকার করে, অত্যাচার মাত্রাছাড়া হয়। এর প্রভাবে মুসলিম লিগের আবির্ভাব এবং বঙ্গভঙ্গ।

৬৫। উপনিবেশের শেষকালে শাসকেরা সেচে বিনিয়োগ করলে কিছু এলাকায় অবস্থা বদলাতে শুরু করে।

৬৬। বোম্বে ও কলকাতায় শিল্প এবং ব্যবসায় ইওরোপীয়দের উপস্থিতির ভিন্ন মাত্রা শ্রম সম্পর্ক তৈরি করে। বোম্বেতে, সাধারণ পুঁজিবাদীরা পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের মধ্যে দর কষাকষির সম্পর্ক তৈরি করতে পেরেছিল। অন্যদিকে, কলকাতায় বর্ণবাদী পুঁজিবাদী নিয়োগকর্তা আর শ্রমিকদেরর মধ্যে জবরদস্তিমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়।

-০-

ইন্সটিটিউট অব ডেভেলাপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা সূত্রে অমিয়কুমার বাগচীর পুস্তক তলিকা

His books include Private Investment in India 1900-1939 (1972), The Political Economy of Underdevelopment (1982), a four-volume history of the State Bank of India (1987-97) starting with the Evolution of the State Bank of India, Parts I and II (1987) And Public Intervention and Industrial Restructuring in China, India and the Republic of Korea (1987), Capital and Labour Redefined: India and the Third World (Tulika, New Delhi and Anthem Press, London, 2002), The Development State in History and in the Twentieth Century (New Delhi, Regency Publications, 2004), Perilous Passage: Mankind and the Global Ascendancy of Capital (Rowman & Littlefield, USA, 2005; Indian edition, Oxford University Press, New Delhi, 2006), and Colonialism and Indian Economy, (Oxford University Press, New Delhi,2010). His edited books include (with Nirmala Banerjee as co-editor) Change and Choice in Indian Industry (1981); New Technology and the Worker's Response: Microelectronics, Labour and Society (1995); Democracy and Development (1995); Economy and Organization: Indian Institutions under the Neoliberal Regime (1999); (with Dipankar Sinha and Barnita Bagchi) Webs of History: Information, Communication and Technology from Early to Post-colonial India (2005); (with Krishna Soman as co-editor) Maladies, Preventives and Curatives (2005); (with Gary Dymski) Capture and Exclude: Developing Economies and the Poor in Global Finance (2007).

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
অক্ষরযাত্রা প্রকাশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'পলাশীর প্রান্তরে আজ...' শীর্ষকে প্রকাশিত

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং তীর্থরাজ ত্রিবেদী
রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় ঔপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত ঔপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১-এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বই-এর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বাম-আন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী
বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকাকালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব চন্দন মুখার্জী, অত্রি ভট্টাচার্য
কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০টা হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট সমীক্ষা করার পরিকল্পনা আছে।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্ক-একাউন্ট হয় নি। আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
bank of india, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026

ফারসি ভাষায় গঞ্জ অর্থে সম্পদ। মুঘল আমলে খেলা ছিল - গঞ্জ; আওরঙ্গজেবের ব্যবসায়ী জাহাজের নাম ছিল গঞ্জ কি সওয়ারি। আমরা ছোটলোকের রাজনীতি করারা, পুঁজি বাদ দিয়ে বিকেন্দ্রিভূত উৎপাদন ব্যবস্থা চালানো মুখমণ্ডলহীনেরা, জ্ঞানকেই সম্পদ মানি। সেই জ্ঞান সূত্রে অর্জন করা দক্ষতাই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি জীবধারণের ভিত্তি, যে জ্ঞান, যে দক্ষতা চর্মচক্ষে অদৃশ্য, ত্বকে মোড়া হাতে অবাঙমানসগোচর; আমরা যারা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকারা, আমাদের একক কারখানায় উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে জ্ঞান আর দক্ষতা অধ্যয়ন করি, ফি বাজারে হাটে নিয়মিত ক্রেতার সামনে পরীক্ষা দিই, প্রতি পরীক্ষার ফল নিজে নিজে তুল্য করে নিজেকে আরও একটু জ্ঞানী, দক্ষ করে কারখানা আর তার পরিবেশ, কাজের পদ্ধতিকে আরও কিছুটা পরিবর্তন করে আবার বাজারে, সমাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যাই, জ্ঞান অর্জন করি আলাপের মাধ্যমে - কারিগর হকার চাষীর এ এক অনন্ত শিক্ষা চক্র - জ্ঞানগঞ্জ। জ্ঞানগঞ্জই কারিগর-হকার-চাষী উৎপাদন ব্যবস্থার অক্ষদণ্ড, সে জ্ঞান বুকে, মাথায় জায়মান। আমরাই তারই বাহক।

জ্ঞানগঞ্জ, উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা বৌদ্ধিক জ্ঞানচর্চার আকাশ কুসুম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেতে চায় নি, চেয়েছে চরম বিতর্কিত, প্রায় অনালোচিত বিষয় - উপনিবেশের হাতে তৈরি মুসলমান বিদ্বেষ, বাংলা সাহিত্যে বা সিনেমায় কতটা নগ্ন, সে তথ্য বুঝতে; প্রায় অনালোচ্য ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে আন্দোলনের পক্ষে দাঁড়িয়ে আলোচনার স্ফুলিঙ্গ তৈরি করতে; উপনিবেশের প্রায় অজানা মুঘল জেন্ডার ফ্লুইডিটি তুলে ধরে জ্ঞানচর্চায় উপনিবেশিক স্থিতিশীলতা ভাঙতে; হকার কারিগর চাষীদের পরিকল্পনায় দেশজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনায় নিজেদের জড়িয়ে নিতে; উপনিবেশ বিরোধী চর্চায় পূর্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিতে আমাদের কী করা উচিৎ নয় এবং কী করা উচিৎ সে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছি আদিত্য নিগমের সঙ্গে; খুনি গণহত্যাকারী লুঠেরা ব্রিটিশ উপনিবেশিক রাষ্ট্রনির্মাণ আর তার স্থিতিশীলতা এবং প্যাক্স ব্রিটানিকা প্রকল্পে আর্যতত্ত্ব আর ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা কি ছিল বুঝতে চেয়েছে; দেখেতে চেয়েছে কিভাবে হোয়াটসেপ বাহন হয় মিথ-মিথ্যের পাঠক্রমের; একই সঙ্গে দেখতে চেয়েছে কিভাবে বাঙালি প্রখ্যাতরা বাংলায় দাঁড়িয়ে হিটলারের দোসর হয়; একই সঙ্গে বুঝতে চেয়েছে বাংলার নৌকোকে; উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্প বোঝার সম্মেলনের প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে; মণিপুরের বর্তমান আর সামগ্রিকভাবে উত্তর-পূর্বের ইস্যুগুলো বুঝতে চেষ্টা করেছে সাংবাদীক সুবীর ভৌমিকের বয়ানে; চলতি পুথিতে বোঝার চেষ্টা করছে উপনিবেশিক হিন্দু আইন নির্মাণে, সামাজিক আচারের ও শাস্ত্রীয় লিখন-ঐতিহ্যের প্রভাবে প্রায়োগিক দ্বৈততার আগমনের উপর ভিত্তি করে নীতিকাঠামো নির্মাণের দিকচিহ্নগুলি, উপনিবেশের নয়া গার্হস্থ্য নির্মাণের প্রণালী তৈরি হয়ে পলাশীর তিন দশকেই বঙ্গ মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার হরণ ক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

১। টড়ের তরবারি
২। জি-২০ ডিজিটাল সাম্রাজ্যবাদ
৩। *আপাতত বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে*
৪। হকার চাষী কারিগর ব্যবস্থা
৫। পলাশী থেকে প্যালেস্টাইন
৬। পুথি মুঘল আমলে খোজা - উপনিবেশপূর্ব সময়ের রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি
৭। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - ‘কি করিতে হইবে (না)’ - আদিত্য নিগমের সঙ্গে আলাপচারিতা
৮। হেথা আর্য, হেথা অনার্য: উপনিবেশ দখলে আর্যতত্ত্বের ভূমিকা ও ভদ্রবিত্ত ব্রাহ্মসমাজ
৯। হোয়াটসঅ্যাপ বিশ্ববিদ্যালয়_মিথ ও মিথ্যার পাঠক্রম
১০। নাজি নাগপাশে ভদ্রবিত্ত
১১। বালথাজার সলভিনসের বাঙলার নৌকো
১২। ‘দেশ লুণ্ঠিত হইয়াছে’ উপনিবেশিক রাষ্ট্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম সম্মেলন ২, ৩, ৪ মে, ২০২৪ সমীক্ষা
১৩। অনন্ত লুঠের বাখান
১৪। হিরণ্য একাত্তর
১৫। কেমন আছ মণিপুর
১৬। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - ‘কি করিতে হইবে (না) - নন্দিনী ভট্টাচার্য পাণ্ডার সাক্ষাৎকার
১৭। কৃষি পরাশর
১৮। চলতি প্রাক্-ঔপনিবেশিক অধরা বাংলা গদ্য: একটি অন্বেষণ
১৯। উপনিবেশ বিরোধী চর্চা এবং আমরা - ‘কি করিতে হইবে (না) - অমিয়কুমার বাগচীর সাক্ষাৎকার

জ্ঞা ন গ ঞ্জ

জ্ঞানগঞ্জ তন্ত্র

জ্ঞানগঞ্জ প্রকাশনা